ছোটদের বিদ্যাসাগর

আনিসুল হক

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.amarboi.org

ছোটদের বিদ্যাসাগর

আনিসুল হক

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.amarboi.org

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৪৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আশ্বিন ১৪১৫ মে ২০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0346-1

www.amarboi.org

উৎসর্গ

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের পাঠকদের

www.amarboi.org

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.amarboi.org

১

একটা রেলওয়ে স্টেশন। রেলগাড়ি থেকে নেমেছেন এক ডাক্তার বাবু। তার হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। এতটুকু ব্যাগ সহজেই হাতে করে নিয়ে যাওয়া চলে। তবু ডাক্তার বাবু 'কুলি' 'কুলি' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। একজন এগিয়ে এল ডাক্তার বাবুকে সাহায্য করবে বলে। তার পরনে ধুতি, গায়ে মোটা চাদর। পায়ে সামান্য চটি। কুলি এসেছে ভেবে ডাক্তার তার হাতে ব্যাগ তুলে দিলেন। লোকটাও ব্যাগটা নিয়ে স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো ডাক্তার বাবুর পাল্কিতে পৌঁছে দিল। ডাক্তার তাকে দুটি পয়সা দিতে হাত বাড়ালেন। লোকটা বলল, 'না না, পয়সা দিতে হবে না, আপনি এত ছোট ব্যাগ নিয়ে এত বড় বিপদে পড়েছিলেন দেখে আপনাকে সাহায্য করতে আমি এগিয়ে এসেছি।'

'পয়সা দিতে হবে না? তুমি কেমন কুলি?'

'আমি ঠিক কুলি নই।'

'তুমি কুলি নও?'

'না। আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। লোকে অবশ্য আমাকে বিদ্যাসাগর বলে ডাকে।'

ডাক্তার বাবু লজ্জায় মারা যান আর কী! তাড়াতাড়ি তিনি ওই লোকের পায়ে পড়লেন। 'আপনি বিদ্যাসাগর। আপনি তো দয়ার সাগর। লোকের উপকার করাই আপনার স্বভাব। আপনি আজ আমাকে অনেক বড় একটা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। এরপর থেকে আমি নিজের কাজ নিজের হাতেই করব।'

হ্যাঁ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই রকমই। খুব সাধারণ পোশাক পরে থাকতেন। কিন্তু তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত দেশজোড়া। সবাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর আর দয়ার সাগর বলেই

www.amarboi.org

জানত। জানত যে তিনি ভীষণ বড় মানুষ। তাঁকে দেখতে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত। কিন্তু যারা তাঁর সম্পর্কে আগে থেকে জানত না, তারা তাঁকে অনেক সময় চিনতেও পারত না।

সেদিন ছিল রোববার। বিদ্যাসাগর তার বাড়ির সামনে বাগানে কাজ করছিলেন। এমন সময় মেদিনীপুর থেকে চারজন লোক এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই বাগানের মালি। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, এই, বিদ্যাসাগর মশায় কি বাড়ি আছেন?

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, আপনারা একটু বসুন, তিনি একটু ব্যস্ত আছেন।

তারা বসলেন। বিদ্যাসাগর বাগানে নিড়ানির কাজ করেই চলেছেন। একটু পরে অতিথিরা বললেন, 'ও হে তামাক খাওয়াতে পারো?'

—'আজ্ঞে, পারি।'

চারটি হুঁকো সাজিয়ে বিদ্যাসাগর তাদের তামাক দিলেন।

তারপর আবার লেগে পড়লেন বাগানের কাজে। খানিকক্ষণ বাদে তারা আবার তাড়া দিলেন, 'দ্যাখো না। বড় দেরি হচ্ছে যে!'

এবার হাতের কাজ শেষ করে বিদ্যাসাগর বললেন, 'কী দরকার এবার আমাকে বলুন।'

'তোমাকে বলব কেন। তুমি বিদ্যাসাগর মশাইকে খবর দাও না!'

'আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর।'

অতিথিরা যেন লাফিয়ে উঠলেন। আপনিই বিদ্যাসাগর! তারা বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিলেন।

২

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা তখন পরিচিত ছিল হুগলি জেলা বলে। সেই জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করল এক শিশু।

www.amarboi.org

শিশুটির বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা হাটে গিয়েছিলেন। আর এদিকে মা ভগবতী দেবী পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

ঠাকুরদা রামজয় ছুটলেন ছেলের বাবাকে খবরটা দেবার জন্যে।

বাবা হাট থেকে ফিরছেন।

ঠাকুরদা তাকে বললেন, 'একটা এঁড়ে বাছুরের জন্ম হয়েছে।'

বাবা ভাবলেন, তাদের একটা গাভীর বাচ্চা হওয়ার কথা। সেই গাভী নিশ্চয়ই একটা বাছুর পয়দা করেছে। তিনি গোয়ালঘরের দিকে ছুটলেন।

ঠাকুরদা বললেন, ওরে কোথায় যাচ্ছিস।

বাবা বললেন, গোয়ালঘরে। নতুন বাছুরটাকে দেখি।

'আরে গোয়ালঘরে নয়। আঁতুরঘরে। আয় আমার সঙ্গে।'

ঠাকুরদা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নবজাতকের মুখ দেখালেন। ঠাকুরদার মনে ভারি গর্ব। চোখেমুখে গৌরবের আলো। তিনি বললেন, 'এই দেখ তোর এঁড়ে বাছুর। এঁড়ে বলেছি বলে মন খারাপ করিস না। কিছুদিন আগে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার ঘরে একটা নাতি জন্মেছে। সে বড় হয়ে সবাইকে হারিয়ে দেবে। সে যা করতে চাইবে, তাই করে ছাড়বে। এর দয়ার কথা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। আমার সেই স্বপ্নই সত্য হতে যাচ্ছে। আমার নাতির জন্ম হয়েছে। এই নাতি আমার স্বপ্ন সফল করবে। সে মানুষের উপকার করবে। দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এর নাম হোক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।'

বাবা এই গল্প অনেকদিন করেছেন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের সামনে। কারণ ছোটবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ভীষণ জেদি আর একগুঁয়ে। বাবা যদি বলতেন, ডানে যা, ঈশ্বর বাঁয়ে চলত, আর বাবা যদি বলতেন, বাঁয়ে চল, ঈশ্বর ডানে সরে যেত। বাবা হয়তো বললেন, ঈশ্বর, যাও, স্নান করে এসো। ঈশ্বরকে সেদিন আর কেউই স্নান করাতে পারত না। বাবা যদি বলতেন, ঈশ্বর, আজকের দিনটা বেশ ঠাণ্ডা, আজ আর স্নান করার দরকার নেই। অমনি ঈশ্বর চলল পুকুরঘাটে, আজ সে স্নান করবেই।

www.amarboi.org

বাবা ঈশ্বরের এই মর্জি বুঝে ফেললেন। এরপর থেকে বাবা ছেলেকে বলতেন উল্টো কথা। ঈশ্বর, আজ আর পড়া কোরো না, আজ বেশি করে খেলবে। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর খেলা বাদ দিয়ে পড়তে বসে যেত। এইসব কাণ্ড দেখে বাবা বলতেন, তুই হবি না এই রকম, জন্মের সময় তোর ঠাকুরদা যে তোকে এঁড়ে বাছুর বলেছিল। তুইতো এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হবিই।

বড় হয়েও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে এই একগুঁয়ে স্বভাবটা ছিল। তিনি যা করবেন বলে মনস্থির করতেন, তা করেই ছাড়তেন। এমনকি কর্মস্থলে তার বড়কর্তা ইংরেজরাও যদি তার মত মেনে নিতে না চাইত, তিনি চাকরি ছেড়ে দিতেন, কিন্তু নিজের মতের বাইরে কোনো কাজে রাজি হতেন না।

অনেক বড় বড় কাজ তিনি করে গিয়েছিলেন সমাজের আর মানুষের ভালোর জন্য। সেসব করতে গিয়ে তাঁকে কত বাধার মুখেই না পড়তে হয়েছে। কত নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে। তবু তিনি পিছপা হননি।

ঈশ্বরচন্দ্র তার স্বভাবের এই বলিষ্ঠতাটা তার ঠাকুরদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আর তার দয়া-মমতা ভালোবাসার গুণটা তিনি পেয়েছিলেন তার মা ভগবতী দেবীর কাছ থেকে।

ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ। তাঁর ছোটবেলা থেকেই তিনিও একগুঁয়ে, জেদি আর সাহসী। সঙ্গে সব সময় একটা লোহার রড রাখতেন। ওই সময় তাদের এলাকায় ডাকাতদের খুব উৎপাত ছিল। ডাকাতের ভয়ে কেউ একা চলাচল করত না। কিন্তু রামজয় একাই চলতেন। তাঁর সঙ্গের লৌহদণ্ডটা সব সময় প্রস্তুত থাকত। দু একবার ডাকাতরা তাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে উল্টো মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। শুধু কি চোর-ডাকাতের ভয়, চারদিকে বনজঙ্গল, ছিল বাঘভালুকেরও ভয়। একবার রামজয় হেঁটে বনমালীপুর থেকে মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। একটা খাল পড়ল পথে। সেটা পার হয়ে যেই না তিনি তীরে উঠেছেন, অমনি একটা ভালুক আক্রমণ করে বসল রামজয়কে। আর অমনি রামজয় চালাতে শুরু করলেন তার লোহার লাঠি। ভালুক তাকে আক্রমণ করছে তার ধারাল নখর দিয়ে, আর রামজয় তাকে পেটাতে

www.amarboi.org

লাগলেন লোহার রড দিয়ে। ডাণ্ডা মেরে ভালুকটাকে ঠাণ্ডা করে ফেললেন চিরতরে। তারপর ফিরে এলেন ঘরে।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস ছিলেন খুবই গরিব। তিনি অল্প বয়সে কলকাতা যান ইংরেজি শিখবেন বলে। আশ্রয় নেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। টাকাপয়সা নেই পকেটে, তিনি কোনো ভালো ইশকুলে ভর্তি হবেন কী করে? শেষে বাঙালি একজনকে পাওয়া গেল, যিনি মোটামুটি ইংরেজি জানেন, তার কাছে ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখবেন। কিন্তু এই শিক্ষক মশাই দিনে ঘোরেন নিজের অর্থ-উপার্জনের ধান্ধায়। তিনি তাই দিনে শেখাবেন না, রাতে তার বাড়িতে যাওয়া শুরু করলেন ঠাকুরদাস। ফিরতে ফিরতে রাত হতো। আত্মীয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। আশ্রিত ঠাকুরদাস না খেয়েই রাত কাটিয়ে দিতেন। না খেয়ে থাকতে থাকতে ঠাকুরদাস শুকিয়ে কাঠি হয়ে যেতে লাগলেন। শিক্ষক মশাই তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? ঠাকুরদাস এই প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন। সব খুলে বললেন শিক্ষক মশাইকে। এই সময় সেখানে আরেকজন উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরদাসের দুঃখের কাহিনী শুনে তার ভারি দয়া হলো। তিনি ঠাকুরদাসকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন।

ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতা নিজেই ছিলেন গরিব। তাদের কোনোদিন খাওয়া জুটত, কোনোদিন জুটত না।

কলকাতায় ঠাকুরদাসের সম্বল ছিল একটা ভাত খাবার থালা আরেকটা ঘটি। তাই নিয়ে একদিন তিনি বের হয়ে পড়লেন পেটের খিদেয়, এগুলো বিক্রি করে তবে যদি কিছু খাবার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু কেউই তার থালা-ঘটি কিনতে রাজি না। কারণ অপরিচিত লোককে কেউ বিশ্বাস করে না, পাছে এগুলো চোরাই জিনিস হয় আর কোনো বিপদ-আপদ ঘটে।

আরেকদিনের কথা।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় ঠাকুরদাসের অবস্থা খারাপ। খিদে ভুলতে তিনি হাঁটছেন কলকাতার পথে পথে। দেখতে পেলেন একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা মুড়িমুড়কি বিক্রি করছেন।

www.amarboi.org

ঠাকুরদাস তাকে বললেন, একটু জল পাওয়া যাবে?

ব্রাহ্মণকে শুধু জল দেওয়া যায় না। বিধবা মুড়িওয়ালি তাই তাঁকে বসিয়ে একটু মুড়ি-মুড়কি আর জল খেতে দিলেন।

ঠাকুরদাস খিদেয় অস্থির হয়ে গোগ্রাসে সেসব খেতে লাগলেন।

নারীটি জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয়নি'

'না মা। আজ খাওয়া হয়নি।'

'আচ্ছা। তুমি বসো।'

এই দয়ালু নারীটি ঠাকুরদাসকে বসিয়ে গয়লার কাছ থেকে দইমিষ্টি নিয়ে এলেন। মুড়ি-মুড়কি-দই-মিষ্টি খাওয়ালেন প্রচুর। তারপর বললেন, এরপর যেদিন তোমার দরকার হবে, সেদিন এসে ফলার করে যেও।

ঠাকুরদাসও এরপরে যখনই খাবার জোগাড় করতে পারতেন না, ওই বিধবার দোকানে গিয়ে পেট ভরে ফলার করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরে তার বাবার এই দুঃখের কাহিনী লিখে রেখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, বাবার মুখে এই দুঃখকষ্টের কাহিনী শুনে তার অন্তর জ্বলে যেত। আবার নারীজাতির ওপরে তার শ্রদ্ধা ভালোবাসা মমতা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। ঈশ্বরচন্দ্রের মতে, নারী বলেই ওই বিধবা মুড়ি বিক্রেতার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এক অচেনা অজানা মানুষকে এইভাবে পেটপুরে খাওয়ানো।

নারীর ওপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তাই ভক্তি ছিল চিরটাকাল। নারীর দুঃখ দূর করার জন্যে তিনি সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন। নারীর ভালোর জন্যে তিনি অনেক বড় বড় কাজ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবী ছিলেন খুবই দয়ালু আর পরোপকারী। তিনি তার গ্রামের প্রতিবেশীদের নানাভাবে সেবা করতেন, সাহায্য দিতেন। কারও অসুখ হলে তিনি তার সেবাযত্ন করতেন, কেউ খেতে পাচ্ছে না শুনলেই তিনি তার খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বড় হয়ে যখন কলকাতায় কাজ করেন, কলকাতায় থাকেন, তখন একবার তাদের গ্রামের বাড়িতে আগুন লেগেছিল। ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র

www.amarboi.org

চেষ্টা করেছিলেন মাকে শহরে নিয়ে যেতে, কিন্তু মা রাজি হননি। বলেছিলেন, অনেক গরিব ছেলেমেয়ে আমার বাড়িতে খেয়ে এই গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করে, আমি যদি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাই, ওই গরিব বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে?

একবার ঈশ্বরচন্দ্র মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা, বছরে একদিন পুজো করতে অনেক টাকাপয়সা খরচ হয়, সেই টাকা পুজোয় ব্যয় করা ভালো, নাকি গ্রামের গরিব মানুষদের মাসে মাসে কিছু কিছু করে সাহায্য হিসেবে দেওয়া ভালো। গ্রামের এই নারী কী জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'গ্রামের গরিব মানুষ যদি রোজ ভাত খেতে পায়, তাহলে সেই ব্যবস্থা করা ভালো, পুজো করার দরকার নেই।' কতখানি সাহস আর মায়ামমতা থাকলে এই কথা একজন গ্রামবাসী নারী বলতে পারেন!

৩

বীরসিংহ গ্রামে একটা পাঠশালা ছিল। সনাতন বিশ্বাস নামে একজন সেখানে পড়াতেন। সনাতন ছোট ছোট বালকদের খুবই শাস্তি দিতেন, প্রহার করতেন। শিশুরা তার পাঠশালায় যেতে ভয় পেত।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা শুনতে পেলেন অন্য গ্রামে একজন শিক্ষক আছেন, তার নাম কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি খুবই ভালো পড়ান। ছাত্রদের খুবই যত্ন করে সবকিছু শেখান। তার কাছে ছাত্ররাও খুব সহজে সব কিছু শিখে ফেলতে পারে। তিনি ছাত্রদের মোটেও মারধর করেন না।

বাবা সেই শিক্ষককে ডেকে এনে বীরসিংহ গ্রামে একটা পাঠশালা খুললেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ৫ বছর, তখন তাকে ভর্তি করা হলো গ্রামের এই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়।

ছাত্রদের ভালোবাসেন এই গুরুমশাই, পাঠশালার জন্যে খুবই পরিশ্রম করেন, চারদিকে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। বড় হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, কালীকান্ত মহাশয় ছিলেন একজন আদর্শ গুরু।

www.amarboi.org

পণ্ডিত মশাইয়েরও সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠল ঈশ্বর। ঈশ্বরের মেধা আর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার দেখলে, একবার পড়লে সে সেটা মনে রাখতে পারে। একবার কোনো কথা শুনলেই মনে রাখতে পারে, এ রকম ক্ষমতা যার আছে, তাকে বলে শ্রুতিধর। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শ্রুতিধর।

আর পড়াশোনার ব্যাপারে তার মনোযোগও ছিল খুব বেশি।

সেকালের পাঠশালা। তখন কিন্তু লেখার জন্যে কাগজ পেত না পাঠশালার ছাত্ররা। প্রথমে তাদেরকে লিখতে হতো তালপাতায়। তালপাতার চিকন চিকন ফালি গোছা করে রাখতে হতো। এটাকে বলা হতো পাততাড়ি। লেখা শেষ হলে পাততাড়ি গুটিয়ে ছাত্ররা বাড়ি ফিরত। সেখান থেকে এখন একটা বাংলা প্রবাদ হয়েছে, পাততাড়ি গোটানো। দোয়াতে কালি থাকত। কলমও হতো বাঁশ, বেত, বা কাঠ কেটে বানানো। পাখির পালকের দাড়ি কেটে সরু মাথা বের করেও কলম বানানো হতো।

পণ্ডিত মশাই তালপাতায় প্রথমে লিখে দিতেন একটা একটা করে অক্ষর—অ, আ, ক, খ। কিংবা ১,২,৩,৪। আর ছাত্ররা সেই লেখার ওপরে আঙুল ঘোরাত। আরেকটু বড় হলে ছাত্ররা তালপাতার বদলে পেত কলাপাতা।

ঈশ্বর বর্ণমালা আর অঙ্ক লিখতে ও পড়তে শিখে ফেলল তাড়াতাড়িই।

আর পড়াশোনার বাইরে সে ছিল ভয়াবহ দুষ্টু।

তার দুষ্টুমিতে পাড়াপ্রতিবেশী সব অস্থির। পাড়ার এর গাছের ফল, ওর গাছের মূল তার অত্যাচারে গাছে রাখা দায়। কাপড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে, সে তার ওপরে ময়লা-আবর্জনা মেখে রাখে। পথ চলতে চলতে কাঁচা ধানের শিষ ছিঁড়ে নেয়, মুখে পোরে, কিছুটা চিবোয়, বাকিটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করে। একবার তো যবের শিষ মুখে পুরলে সেই শিষ আটকে গেল গলায়। ঈশ্বর মরমর। তার ঠাকুরমা বহু কষ্টে গলা থেকে সেই শিষ বের করেন। মরতে মরতে বেঁচে যায় ঈশ্বর।

ছোটবেলায় ঈশ্বর অসুখবিসুখেও ভুগেছে খুব। এক বছর পাঠশালা পড়ে পরের পুরো একটা বছর আর তার পড়া হয়নি, সে ভয়ানক রোগে পড়েছিল বলে।

www.amarboi.org

তারপর শরীরটা যখন একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠল, আবার সে নিয়মিত পাঠশালায় যেতে শুরু করে দিল।

প্রথমবার কলকাতা যাচ্ছে ঈশ্বর। বাবার সঙ্গে। বাবা কলকাতাতেই চাকরি করেন। মাসে ১০ টাকা বেতনের চাকরি। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা ৬০ মাইল দূরে। এই পথটা হেঁটে যেতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। কোনো যানবাহন নেই। বড়লোকেরা পাল্কিতে যায়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্ররা মোটেও বড়লোক নন।

প্রথমবার কলকাতা যাওয়ার পথে বাবা সঙ্গে আরেকজন লোক নিলেন। ঈশ্বরও তাদের সঙ্গে হাঁটছে। বয়স ৭ কি ৮। সে কি আর বেশি দূর হাঁটতে পারে? কিছুক্ষণ হাঁটার পরে যখন তার পা আর চলে না, তখন সে সঙ্গের লোকটার কাঁধে চড়ে বসে। এইভাবে চলতে চলতে তারা ৪০ মাইলের মতো পাড়ি দিলেন। আর আছে ২০ মাইল। এরপর শুরু হলো পাকা রাস্তা।

আর এক মাইল পথচলার পর তাঁরা যেখানে এলেন কলকাতা সেখান থেকে ১৯ মাইল দূরে। পথের ধারে মাইলফলকে ইংরেজিতে ১৯ লেখা। কিন্তু ঈশ্বর ইংরেজি শেখেনি তখনও। তার মনে হলো, আরে, রাস্তার ধারে বাটনা-বাটা শিল কেন পুঁতে রেখেছে। সে বলল, বাবা, এখানে শিল পুঁতে রেখেছে কেন?

বাবা বললেন, এ শিল নয় রে। এ হলো মাইলস্টোন। এই যে দেখছিস, এটা হলো নাইনটিন, মানে উনিশ। ইংরেজিতে লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্র লেখাটা ভালো করে লক্ষ করল। তারপর বলল, এই দাড়ির মতো জিনিসটা তাহলে ১। আর ৭-এর মতো দেখতে, এটা ইংরেজির ৯।

বাবা বললেন, ঠিক তাই। এখানে উনিশ লেখা, তার মানে এখান থেকে কলকাতা আর মাত্র ১৯ মাইল দূরে।

ঈশ্বর বলল, তাহলে একমাইল পরে কি লেখা থাকবে ১৮?

'হ্যাঁ।'

'১৮, ১৮-র পরে ১৭, তারপর ১৬, এইভাবে কমতে থাকবে?'

বাবা বললেন, ঠিক তাই।

www.amarboi.org

ঈশ্বর মনে মনে ভাবল, তাহলে তো সে পথ চলতে চলতে মাইলফলক দেখেই ইংরেজি অঙ্ক শিখে ফেলতে পারবে।

তাই সে করতে লাগল। খুব মন দিয়ে প্রত্যেকটা মাইলফলক খেয়াল করতে লাগল। ১৯ থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত গিয়ে সে শিখে ফেলল ইংরেজির ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত অঙ্কগুলো কেমন দেখতে। সে বলল, বাবা, আমার ইংরেজি অঙ্ক চেনা হয়ে গেছে।

বাবা বললেন, আচ্ছা কেমন চিনেছ, এরপরে পরীক্ষা হবে।

নাইন লেখা মাইলফলকের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, বলো তো ঈশ্বর, এটা কী?

ঈশ্বর বললেন, এটা ৯।

এরপর আবার এক মাইল হেঁটে তারা পৌঁছলেন এইট্‌ লেখা মাইলফলকের কাছে। 'এটা কী?'

'এটা আট।'

তারপর আবার পরের মাইলস্টোনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কত?'

'সাত।'

বাবা ভাবলেন, ছেলে নিশ্চয়ই মুখস্থ বলছে, কারণ ৯ এর পরে ৮ হবে, ৮ এর পরে ৭, এটা তো সে জানেই। কাজেই একটা কৌশল করা যাক।

তিনি পরের মাইলফলকটা আর ছেলেকে দেখালেন না, গল্পচ্ছলে ভুলিয়ে একেবারে ৫ লেখা ফলকের কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, এটা কত?

ঈশ্বর জবাব দিল, 'বাবা এটা হওয়ার কথা ছিল ৬, কিন্তু এরা ভুল করে ৫ লিখে রেখেছে।'

বাবা ভীষণ খুশি হলেন। ফিরে এসে তিনি ছেলের এই মেধার গল্প সকলকে করে বেড়াতে লাগলেন। বীরসিংহের গুরুমশাই কালীকান্ত এই গল্প শুনে ঈশ্বরের চিবুক ধরে বললেন, 'বেশ বাবা বেশ।' আর বাবাকে বললেন, 'আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়ার ব্যাপারে যত্ন করবেন। যদি বেঁচে থাকে, ও মানুষ হতে পারবে।'

৮ বছর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বর পড়ল গ্রামের পাঠশালায়। এরপর তাকে কলকাতায় পড়ানো উচিত, সবাই একবাক্যে বলতে লাগল।

www.amarboi.org

শিক্ষক কালীকান্ত বললেন, 'আমার এখানে যা শেখার ছিল, ঈশ্বর তা খুব ভালোভাবে শিখেছে। এখানে ওর আর শেখার কিছু নেই। ওকে এরপর কলকাতা নিয়ে যান। এই রকম মেধা আর প্রতিভা সহজে দেখা যায় না। ওকে অবশ্যই ভালোভাবে লেখাপড়া করানো উচিত। ও একদিন অনেক বড় হবে।' বিশেষ করে মাইলফলকের গল্প শুনে সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'তবে তো একে রীতিমতো ইংরেজি পড়ানো উচিত।'

কেন ইংরেজি পড়ানো উচিত? কারণ এটা ইংরেজ আমল। বাবার বন্ধুদের মত হলো, 'মোটামুটি ইংরেজি শিখলে, লিখতে, পড়তে আর বলতে পারলে, ঈশ্বর ইংরেজদের বাড়িতে, নয়তো অফিসে, নয়তো দোকানে একটা চাকরি পেয়ে যাবে।'

কিন্তু বাবা কিছুতেই ছেলেকে ইংরেজি পড়াবেন না। এর কারণ তাদের বংশের সবাই সংস্কৃতের কারবারি ছিলেন। বাবা নিজে সংসারের অভাবের তাড়নায় কিছু ইংরেজি শিখে কলকাতায় ছোট কাজ করছেন বটে, কিন্তু তার ইচ্ছে ছেলে সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত হবে, তারপর নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে সেখানে সংস্কৃতের বড় বিদ্যালয় স্থাপন করবে। চতুষ্পাঠী বলে পরিচিত একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাবার স্বপ্ন।

তা-ই ঠিক হলো। ঈশ্বর ৮ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে পড়তে তার গ্রাম বীরসিংহ ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলো।

তার মা জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে কেউ মায়ের কোল ছেড়ে পড়াশোনা করতে কলকাতায় যায়? এ কথা সাত গাঁয়ে কেউ কোনোদিন শুনেছে?

চোখের জল গোপন করে বাবার হাত ধরে আবার হাঁটতে হাঁটতে দীর্ঘ ৬০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় চলে এল।

৪

কলকাতায় ঠাকুরদাস থাকতেন জগদ্দুর্লভ সিংহ নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। জগদ্দুর্লভের অধীনেই তিনি চাকরি করেন।

www.amarboi.org

এই মনিব ছিলেন খুবই দয়ালু। তারই বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্রেরও ঠাঁই হলো। মনিবের ছোটবোন রাইমণিও এই বাড়িতে থাকতেন। রাইমণির একটা ছেলে ছিল গোপাল নামে। সে ছিল ঈশ্বরের সমবয়সী। দুজনে তাই ভারি ভাব। আর রাইমণি! তিনি গোপাল আর ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন সমানভাবে, দুজনই যেন তার নিজের ছেলে। পরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, তিনি যে নারীজাতির জন্যে গভীর মমতা বোধ করতেন, তার একটা কারণ ছিল রাইমণি। রাইমণির এত স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন যে তার কথা মনে হলেই তার চোখে জল চলে আসত। তিনি বলেছেন, যে রাইমণির স্নেহ, দয়া পেয়েছে, তার আর নারীজাতির পক্ষে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

রাইমণির ভালোবাসা পেয়েছিলেন বলেই ঈশ্বর মা, ঠাকুরমার কাছ থেকে এত দূরে এসে টিকতে পেরেছিলেন।

তবে কলকাতায় এসেও তার শরীর খারাপ হয়েছিল। আবার তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল। বিনা চিকিৎসায় ৭/৮ দিনের মধ্যে ঈশ্বর সেরেও উঠল।

বাবা ঠাকুরদাসের সঙ্গে সে আবার চলল কলকাতা।

৬০ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

এর আগে সঙ্গে তাকে কোলে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক ভাড়া করা হয়েছিল।

এবার ঈশ্বর বলল, 'বাবা আমি একাই হেঁটে যেতে পারব। কাউকে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে না।'

১২ মাইল দূরে ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের মামাবাড়ি। সেই পর্যন্ত ঈশ্বর চমৎকার হেঁটে আসতে পারল। সেই আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার তারা রওনা হলো। এরপর আরো ১২ মাইল দূরে তাদের আরেক আত্মীয়ার বাড়ি। তিনি কিছুদিন আগে অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখতেও যেতে হবে। তারা পথ চলছেন। মাইল ছয়েক যাওয়ার পর ঈশ্বর আর কিছুতেই হাঁটতে পারছে না। তার পা আর চলছে না। সে একবার বসে পড়ে। আরেকবার ওঠে। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। ধীরে ধীরে হাঁটে। বাবা মুশকিলে পড়লেন। লোভ দেখালেন, ওই মাঠটা পাড়ি দাও। তারপর খুব মিষ্টি তরমুজ পাওয়া যাবে। তোমাকে তরমুজ কিনে খেতে দেব।

www.amarboi.org

মাঠটা কোনোমতে পার হওয়া গেল। বাবা তরমুজ কিনে খেতেও দিলেন। সেই তরমুজ ভারি মিষ্টিও ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে দুপুরবেলা তার ভালোও লাগল। কিন্তু পায়ের ব্যথা যে কমে না। পায়ে হাঁটা তো দূরের কথা, ঈশ্বর তো দাঁড়াতেই পারছে না।

বাবা তাকে নানা কিছুর লোভ দেখালেন। ধমক দিলেন। ভয় দেখালেন, তোকে ফেলেই চলে যাব কিন্তু। তারপর ছেলেকে ফেলে খানিকটা পথ একলা হেঁটে এগিয়েও গেলেন। ঈশ্বর মাটিতে বসে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। ফের ফিরে এসে বাবা তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। বাবারও রোগা শরীর। সামান্য পথ গিয়ে আবার ঈশ্বরকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, কেন তুই আমাকে লোক আনতে দিলি না।

অনেক কষ্টে তারা সন্ধ্যার আগে আগে আত্মীয়বাড়িতে পৌঁছলেন।

তারপরের দিন আবার যাত্রা। আরো এক রাত পথে কাটাতে হলো। এইভাবে তিনরাত চারদিন লাগল তাদের কলকাতা পৌঁছতে। এভাবেই ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতা-বীরসিংহ যাতায়াত করতে হতো। আর এখন? হয়তো দু ঘণ্টা লাগবে কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামে পৌঁছাতে।

কলকাতায় মাস কয়েক একটা পাঠশালায় পড়ল ঈশ্বর। তারপর ১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বর ভর্তি হলো কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। তার বয়স তখনও ৯ হয়নি।

৫

বাবা ঠাকুরদাসের আয় মাসে ১০ টাকা। এর মধ্যে ৫ টাকা তিনি পাঠিয়ে দেন গ্রামের বাড়িতে। আর থাকে ৫ টাকা। বাকি ৫ টাকায় পিতাপুত্রের কলকাতার দিনযাপন। এর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মেজভাই দীনবন্ধুকেও কলকাতায় আনা হলো।

খুবই কষ্ট করে যায় তাদের দিন। কোনোদিন আহার জোটে, কোনোদিন ঠিকমতো জোটে না। কখনও শুধু ভাত। কখনও শুধুই তরকারি।

www.amarboi.org

ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই রাঁধে। সকাল ১০টায় কলেজের ক্লাস শুরু। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজার করা, রাঁধাবাড়া, বাসনকোসন মাজা। বাটনা বাটতে হয়, কাঠ চিরতে হয়। তার হাতের নখ আর আঙুল ক্ষয়ে যেতে লাগল।

বাবা প্রথম প্রথম তাকে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতেন। আবার বিকেলে ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে রেখে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন গভীর রাতে। তার কাজ রাত একটা পর্যন্ত। পরে আস্তে আস্তে ঈশ্বর কলকাতার রাস্তায় পথচলা শিখে ফেলল। সে এখন একা একাই কলেজে যায়।

তখনকার কলকাতার রাজপথের দুধারে শুধু ইটের দালান ছিল, তা নয়। কুঁড়েঘর, কাঁচা ঘরবাড়ি ছিল অনেক। আস্তে আস্তে ইংরেজরা বড় বড় ভবন তৈরি করছে। বাঙালি বা ভারতীয় বড়লোকরাও কোঠাবাড়ি বানাচ্ছে। রাস্তায় হাতি চলত, ঘোড়া চলত, ঘোড়াগাড়ি চলত, গরুগাড়ি চলত। এ দেশে যে প্রবাদ আছে, লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই, তার কারণ তখনকার দিনে তো আর রাস্তায় মটরগাড়ি চলত না। তবু রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটত। বিশেষ করে ঘোড়া কখনও কখনও পাগলা হয়ে যেত, দুপাশের পথিকের গায়ে উঠে পড়ত। তাই সাবধানে চলতে হতো পথিকদের।

৮/৯ বছরের ঈশ্বরচন্দ্র একা একাই কলেজে যায়। সাবধানেই পথ চলে। মাথায় থাকে একটা ছাতা। ছোট্ট একটা মানুষ। তার ছোটখাটো শরীর। তার চেয়ে ছাতাটাই বড়। যখন সে ছাতা মাথায় হাঁটে, তখন মনে হয় যেন ভেতরে কোনো মানুষ নেই, শুধু ছাতাটাই যাচ্ছে হেঁটে।

আর ছেলেটার মাথাটাও দেহের তুলনায় বড়সড়। কলেজের সহপাঠীরা তাকে তাই খেপায় যশুরে কৈ বলে। যশোরের কৈয়ের নাকি মাথা বড়। যশুরে কৈ বলতে বলতে ছাত্ররা সেটাকে উল্টে ফেলল। এবার তার নাম হলো কশুরে যৈ। আর কশুরে যৈ শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ঈশ্বর। তার ভারি রাগ হয়। কিন্তু রাগলে সে শুধুই তোতলাতে থাকে। কথা বলতে পারে না। ছেলেদের মজা তাতে আরও বেড়ে যায়। তার পেছনে ছেলেরা আরও বেশি নিষ্ঠুরতা নিয়ে লেগে পড়ে।

www.amarboi.org

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে লেখাপড়ায় কেউ পারে না। সে সবার চেয়ে ভালো করে পড়ায় লেখায়। গুরুমশাইদের সবার নজরে পড়ে যায় ছেলেটি। তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসেন তারা, তার প্রতিভায় তারা মুগ্ধ হন।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজের পড়া তৈরি করার সময়ও পায় না। সকালটা তো যায় রাঁধতে বাড়তে। আর ইদানীং বাবা বেশি রাত করে ফিরছেন। রাতের রান্নাবাড়ার দায়িত্বও তারই কাঁধে। সে পড়বে কখন?

কলেজে যাওয়া-আসার পথে সে গুরুমশাইদের শিখিয়ে দেওয়া শ্লোক কিংবা ব্যাকরণের সূত্র আওড়াতে আওড়াতে পথ চলত। কখনও কখনও রাত ৯টায় ছোটভাইটাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে শুয়ে পড়ত। বাবা রাত একটায় এসে তাকে ডেকে দিলে সে সারারাত পড়ত। বাবাও সংস্কৃত ভালো জানতেন। তিনিও পড়তে সাহায্য করতেন। কখনও পড়া ধরতেন। কিন্তু কোনোদিন যদি এত খাটুনির কারণে ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ত, কী ভীষণ মারটাই না মারতেন বাবা। মার খেয়ে ঈশ্বর চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিত। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েরা এসে ছেলেটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। তারা বলতেন, এইভাবে মারধর করা থামাও, না হলে অন্য বাড়ি দেখো।

ঈশ্বর রাত জাগার একটা নতুন ফন্দি তাই আবিষ্কার করে ফেলল। প্রদীপের তেল চোখে মাখালে চোখ জ্বালা করে বটে, কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। ফলে দিব্যি জেগে থেকে পড়া করা যায়।

তারা যে ঘরে থাকত, আর তাদের রান্নাঘরটা, সেসবের অবস্থা ছিল সত্যি করুণ। দিনের বেলাতেও ঘরে কোনো আলো ঢোকে না। জানালা নেই। রান্নাঘরের পাশেই নর্দমা। তাতে কিলবিল করছে নোংরা পোকা। তেলাপোকার নিরাপদ আশ্রয় ছিল যেন বাড়িটা। নর্দমা থেকে কিলবিলে পোকা উঠে আসে রান্নাঘরে। সেসবের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য ঈশ্বর এক ঘটি জল নিয়ে বসে থাকে পাহারায়। চুলোয় ভাত ফুটছে। আর সে বসে বসে রান্নাঘরের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে, যাতে অবাঞ্ছিত কৃমিকীটের

www.amarboi.org

প্রবেশ রোধ করা যায়। কোনো পোকা কিলবিল করে এদিকে এগিয়ে আসতেই জল ঢেলে দিচ্ছে ঈশ্বর। ভেসে যাচ্ছে পোকাটা।

এদিকে না হয় নর্দমার কীটের প্রবেশ রোধ করা গেল। ওদিকে যে তরকারির হাঁড়িতে একটা আরশোলা ঢুকে পড়েছে, সেটা ওই অন্ধকারে কে দেখবে?

বাবা আর ছোটভাই খেতে বসেছে। ঈশ্বর পাতে পাতে খাবার বেড়ে দিচ্ছে। হঠাৎই তার চোখে পড়ল তরকারির মধ্যে একটা তেলাপোকা। সে সেটা নিজের পাতে তুলে নিয়ে কাউকে কিছু না বলে দিব্যি খেয়ে নিল। এছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না। এখন যদি সে বলে, তরকারিতে তেলাপোকা, তাহলে সবারই খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

ঈশ্বরের শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল দেড়হাত চওড়া আর দু হাত লম্বা একফালি বারান্দায়। ঈশ্বর নিজে এখন দুহাতের চেয়ে খানিকটা লম্বাই হয়ে গেছে। বারান্দার কার্নিশটাকে বালিশ বানিয়ে নিজের পা গুটিয়ে তাকে শুতে হয়। কোনোদিন হয়তো সে এসে দেখল, ভাই এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার জায়গায়। তাহলে আজ রাতে আর শোওয়ার জায়গা নেই, শুয়ে কাজও নেই। ঈশ্বর বই নিয়ে চলে গেল রাস্তায়। রাস্তায় আছে গ্যাসবাতি। তার নিচে বসে আপনমনে সারারাত পড়া চালিয়ে গেল ওই ছোট্ট ছেলেটি। তাতে তার প্রদীপের তেলের পয়সাও বাঁচল।

এত কষ্ট করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে যে ছোট্ট ছেলেটি, তার পরীক্ষার ফল হলো কেমন? পরের বছরেই বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখে তাকে মাসে ৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হলো। ৫ টাকা কিন্তু তার বাবার মাসিক আয়ের অর্ধেক। ৫ টাকাতে তাদের কলকাতার ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, আর ৫ টাকা যায় গ্রামে। পুরো ৫ টাকা বৃত্তি পেয়ে গেল সে।

তাদের অভাবের দিনে এটা একটা বিরাট উপকার বয়ে এনেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ঈশ্বরের মন দয়া নামের পদার্থ দিয়ে ঘেরা। বৃত্তির টাকা দিয়ে সে কলেজের ছেলেদের রোজ মিঠাই কিনে খাওয়ায়। গ্রামে গিয়ে দেখেন পড়শিরা না খেয়ে আছে, টাকা দান করে দিয়ে খালি হাতে ফিরে আসে।

www.amarboi.org

ঈশ্বর বৃত্তি পেত, নানা পুরস্কার পেত, সেসবের মধ্যে বইও থাকত। তার হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো ঝকঝকে। শুধু সংস্কৃত নয়, ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতেও প্রবেশ করেছিল। উলস্টন সাহেব নামের এক ইংরেজ এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তবে ইংরেজি শ্রেণীতে ছাত্র বেশি ছিল না, মাত্র ৬ মাসই সেখানে সে পড়তে পেরেছিল। এক বছর ঈশ্বর কম টাকার বৃত্তি পেয়েছিল। সে ভীষণ ক্ষেপে গেল। বলল, আর পড়বই না। গ্রামে গিয়ে পাঠশালায় পড়াব। কিন্তু তার বাবা আর অধ্যাপকেরা তাকে বোঝালেন। এ বছর কম পেয়েছ তো কী হয়েছে, সামনের বছর আবার ভালো করবে। জীবনে চলার পথে কেবল সাফল্য আসবে, তাই তো নয়, বাধা আসবে, ব্যর্থতা আসবে। তাতে কেউ যদি দমে যায়, তাহলে তো চলবে না। তোমার মেধা আছে, যোগ্যতা আছে, তাহলে কেন তুমি পড়া ছেড়ে দেবে? সেটা তো জয়লাভ করা হলো না।

ঈশ্বর কলেজ ছাড়তে পারল না শেষ পর্যন্ত।

কলেজের ছুটিতে তারা মাঝে-মধ্যে গ্রামে যেত। তার মায়ের কাছে, ঠাকুরমার কাছে। গ্রামে যখনই যাক না কেন, ঈশ্বর নেমে পড়ত মাঠে। ছেলেদের সঙ্গে নেমে পড়ত কপাটিখেলায়, লাঠিখেলায়। তবে সংস্কৃত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, এখানে ওখানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও যেতে হতো তাকে। ঈশ্বর বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। তখন সবাই এই ক্ষুদে পণ্ডিতটাকে নিয়ে ধন্য ধন্য করতেন। শ্রাদ্ধ বা কোনো বিশেষ উপলক্ষে সংস্কৃত কবিতা রচনা করতে হবে, গ্রামে সবাই এসে ধরত ঈশ্বরকে। ঈশ্বরও চমৎকার কবিতা রচনা করে দিত।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেলে ঈশ্বর মায়ের অনুসরণে আরেকটা কাজ করত। তা হলো পীড়িত মানুষের সেবাযত্ন করা। কারও অসুখ হয়েছে শুনলেই সে ছুটে যেত তার কাছে। তাকে সেবাযত্ন করত। রোগীর পাশে সারারাত জেগে বসে থাকত। যা দরকার এগিয়ে দিত। এমনকি তাদের নোংরা কাপড় বা বিছানাও পরিষ্কার করে দিতে সে দ্বিধা করত না। তাকে তখনই লোকে দয়াময় বলে ডাকতে শুরু করে। তার অন্তরজুড়ে এমনি মায়া ছিল যে,

www.amarboi.org

কোনো কুকুর বা বিড়ালের মরার খবর শুনলেও সে কাঁদতে আরম্ভ করে দিত।

কলেজে তার অধ্যাপকদের একজন ছিলেন শম্ভুনাথ তর্কবাচস্পতি। এই পণ্ডিত তখন একেবারে বুড়ো থুত্থুরো। নিজের কাজ নিজে করতে পারেন না। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আবার একটা বিয়ে করলে কেমন হয়?

সে যুগে এই ছিল ওই সমাজের নিয়ম। কুলীন বলে যাদের, সেই পুরুষরা ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারে, যখন খুশি তখন, যত খুশি তত, তা এর আগে তার যতজন বউই থাকুক না কেন। আর তার বয়সটাও কোনো ব্যাপার না। একেবারে বুড়োও বিয়ে করতে পারত।

বাচস্পতি তার প্রিয় ছাত্র ঈশ্বরকে বললেন, একটা ভালো পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে, বিয়ে করতে চাই, তোমার মত কী?

ঈশ্বর বললেন, আমার মত জানতে চান? আপনি তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এখনই নড়তে-চড়তে পারেন না। আপনি একটা মেয়ের জীবনে এত বড় সর্বনাশ কেন ডেকে আনবেন। বিয়ে তো দূরের কথা, বিয়ের চিন্তা করাও আপনার জন্য পাপ।

কিন্তু বাচস্পতি তার বালক ছাত্রের কথায় টলবেন কেন। তিনি ঠিকই বিয়ে করলেন। ঈশ্বরকে বললেন, ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিন দেখতে গেলে না? মা মানে বাচস্পতির নতুন বিয়ে করা বউ। ঈশ্বর গেল সেই বাড়িতে বউ দেখতে। বউয়ের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। ঈশ্বর তার মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের কাছে দুটো টাকা উপহার হিসেবে রাখল।

বাচস্পতি বললেন বাড়ির ঝিকে, ওরে, ঈশ্বরের নতুন মায়ের ঘোমটাটা খুলে দে।

বউয়ের মুখ দেখে ঈশ্বর কান্নায় ভেঙে পড়ল। অতি অল্প বয়সী একটা মেয়ে। এখনও শিশু। এই বুড়ো তো দুদিন পরেই মরে যাবে। তখন কী হবে এই শিশুটির।

তাকে কাঁদতে দেখে বাচস্পতি বললেন, অকল্যাণ করিস নে রে। সর।

www.amarboi.org

বাচস্পতি তাকে সরিয়ে নিলেন। নানা কথায় তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন। বললেন, একটু জলখাবার মুখে দে।

ঈশ্বর বলল, এই ভিটায় কখনও জলস্পর্শ করব না।

ঈশ্বর ব্রাহ্মণের ছেলে। বাবার সঙ্গে রোজ তাকে 'সন্ধ্যা' করতে হয়। সন্ধ্যামন্ত্র জপতে হয়। তার কাকার একদিন মনে হলো, ঈশ্বর শুধু ঠোঁট নাড়ে, আসলে সে মন্ত্র পড়ে না। তিনি বললেন, সন্ধ্যামন্ত্রটা একটু জোরে জোরে আওড়াও তো বাপু।

ঈশ্বর পারল না। সন্ধ্যামন্ত্র সে ভুলে গেছে।

এমন যে ছেলে, যাকে বলা হয় শ্রুতিধর, একবার একটা কিছু শুনলে যে মনে রাখতে পারে, সে সন্ধ্যামন্ত্র ভুলে যাবে? এটা কোনো কথা হলো।

আসলে ঈশ্বর সন্ধ্যামন্ত্র, পুজোআর্চা এইসবকে গুরুত্ব দেয়নি। কারণ তার কাছে দেবতা হলেন বাবা-মা। অন্য দেবতায় তার আস্থা নেই। সে কারণেই সে সন্ধ্যামন্ত্র পর্যন্ত ভুলে বসে আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র অবশ্য বিয়ে করেছিলেন অল্প বয়সেই। তার বয়স তখন ১৪ কি ১৬। পাত্রী ৭ বছর বয়সী দীনময়ী। সে সময়ে এ রকম অল্প বয়সেই বিয়ে হতো ছেলেমেয়েদের।

বিয়ের অনুষ্ঠানে ভারি একটা মজা হয়েছিল।

সে সময়ে বিয়ের একটা মেয়েলি কৌতুক ছিল, বাসরঘরে নিজের কনেকে বর নিজেই খুঁজে নিত। এর আগে বর আর কনের তো দেখাও হয়নি কোনোদিন। ছাদনাতলায় দৃষ্টির সময় ঘোমটার আড়ালে কনের মুখ একটিবার হয়তো বর দেখেছে। এরপর বাসরঘরে অনেক মেয়ের ভিড়ে নিজের বউ কোনটি তা শনাক্ত করতে হতো। ঈশ্বরের বিয়ের সময়ও মেয়েরা এই রসিকতা করার চেষ্টা করল। ঘরের মধ্যে অনেক মেয়ে। এর মধ্যে কোনটা ঈশ্বরের বউ। সবাই বলল, তুমি তোমার কনে খুঁজে নাও। ঈশ্বর দেখল, এই মেয়ের দঙ্গলের মধ্য থেকে তার পক্ষে স্ত্রী খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়। সে করল কী, তার বয়সের একটা মেয়ের হাত ধরে বলল, এই আমার কনে। যেমন ধরা, অমনি মহাগণ্ডগোল পড়ে গেল। সবাই ভেবেছিল, ঈশ্বরকে আজ যা হোক একটা মুশকিলে ফেলা যাবে, ওকে বোকা বানানো যাবে, উল্টো ঈশ্বরই সবাইকে বোকা

www.amarboi.org

বানিয়ে ফেলল। কে কার ঘাড়ে পড়বে, কে কোথা দিয়ে পালাবে, পথ খুঁজে পায় না। যে মেয়েটির হাত ঈশ্বর ধরেছে, কেবল সে পালাতে পারছে না, সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার কনে নই। ঈশ্বর বলল, না, ছেড়ে দেব কেন, আমাকে কনে খুঁজতে বলেছ, আমি তোমাকে খুঁজে বের করেছি। তোমাকেই আমার পছন্দ হয়েছে। বয়স্ক গিন্নিরা এসে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও, ও তোমার কনে নয়।

ঈশ্বর বলল, না ছাড়ব কেন। এই আমার কনে। ওকে আমার পছন্দ হয়েছে।

মেয়েটি কেঁদে ঈশ্বরের হাত পা ধরে বলল, দয়া করে ছেড়ে দাও, আমি তোমার কনে এনে দিচ্ছি।

তখন তারা নিজেরাই আসল কনেকে এনে হাজির করল ঈশ্বরের সামনে।

ঈশ্বরের পড়াশোনা খুব ভালোভাবে চলছে। এটা ওটা বৃত্তি আর পুরস্কার জুটছে। ভালো হাতের লেখার জন্য পুরস্কার, সংস্কৃত পদ্য লিখে ১০০ টাকা পুরস্কার—এই রকম নানা পুরস্কার আর স্বীকৃতি সে লাভ করছে নিয়মিত। এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে সে প্রথম শ্রেণীর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছে কিছুদিন এবং বেতন পেয়েছে।

ঈশ্বর ল কমিটির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার পায়। সে সময় ত্রিপুরা জেলায় জজ পণ্ডিতের পদ খালি হয়। ঈশ্বর সেই পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করে। তাকে ওই চাকরির জন্যে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়। কিন্তু বাদ সাধলেন বাবা। বললেন, ত্রিপুরা অনেক দূর। অতো দূরে গিয়ে চাকরি করার দরকার নেই। পিতার কথা ঈশ্বর অমান্য করতে পারল না। সে বরং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগল।

আবার কলকাতাতেই এক বাড়িতে কলেরায় শিশুসমেত লোকে কষ্ট পাচ্ছে শুনে সে ছুটে গেছে। রোগীদের সেবা করেছে। পুলিশের কাছে গিয়ে খবর দিয়েছে, ওই বাড়িতে কলেরা। কী করা যায়। পুলিশ ওষুধ দিয়েছে। সেই ওষুধ নিয়ে আবার সে রোগীর

www.amarboi.org

বাড়ি এসে হাজির। লোক ডেকে রোগীদের নোংরা কাপড়চোপড় ঘরদোর পরিষ্কার করিয়েছে। রোগীদের প্রচুর পানি খাইয়ে তাদের মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়েছে।

৬

১৮৪১ সাল। কলেজের শেষ পরীক্ষায় খুবই ভালো করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তার বয়স তখন ২১ বছর। একই শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়েই ভালো করছে, এ রকম সাধারণত দেখা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র তাই করেছেন। সকলেই বিস্মিত, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম এই কৃতী শিক্ষার্থীকে তারা উপাধি দিলেন 'বিদ্যাসাগর'।

সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নয়, তিনি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর বলে।

কলেজ জীবন শেষ। এবার কর্মজীবনের শুরু। ডিসেম্বরে ফল বেরিয়েছে, ১৮৪১ সালে। ডিসেম্বরেই খবর পেলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার পদ খালি হয়েছে। তিনি আবেদন করলেন সেই পদের জন্যে। ২৯শে ডিসেম্বর ওই কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত হিসেবে তিনি কাজ শুরু করলেন।

বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শুরু হলো তার চাকরি জীবন। বাবা বেতন পান ১০ টাকা, ছেলে ৫০ টাকা। প্রথম চাকরি হিসেবে মোটেও কম নয়। কিন্তু তারও চেয়ে বেশি মর্যাদা।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়ত ইংরেজরা। তখন বিলেত থেকে তারা এদেশে আসত চাকরি করতে। চাকরি পাওয়ার শর্ত ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বাংলা, হিন্দি এইসব এদেশী ভাষা শিখতে হবে।

মার্শাল সাহেব ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি। তিনিই নিয়োগ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে। মার্শাল সাহেব তাকে পরামর্শ দিলেন ইংরেজি আর হিন্দি শিখে নিতে। শেখার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কোনোই ক্লান্তি নেই। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে

www.amarboi.org

নিয়মিত হিন্দি আর ইংরেজি শিক্ষা শুরু করলেন। একজন ইংরেজি সাহিত্য জানা ব্যক্তির কাছে তিনি নিয়মিত যেতেন শেক্সপিয়র পড়ার জন্যে।

হেড পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাজেকর্মে সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব দারুণ খুশি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

বিদ্যাসাগরের ছাত্র সব এসেছে ইউরোপ থেকে, কত দিন ধরে কত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, জাহাজে চড়ে। এখানে চাকরি করবে—তারা এসেছে এই আশায়। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তারা যদি পাস করতে না পারে, তাহলে আর তাদের চাকরি হয় না। আর এই ইউরোপীয়দের কাছে সবচেয়ে কঠিন লাগে এই দেশের ভাষা বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত। তাদেরকে ব্যর্থমনোরথে আবার ইউরোপেই ফিরে যেতে হয়। তাদের জন্যে পরীক্ষাটা একটু সোজা করা যায় না? প্রশ্ন একটু সোজা করা যায়, খাতা দেখবার সময় নম্বর একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়! মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে এই পরামর্শ দেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অনড়, অটল। না, আমাকে দিয়ে কোনো অন্যায় করানো যাবে না। আমি বরং চাকরি ছেড়ে দেব, কিন্তু কাউকে অন্যায়ভাবে পাস করাতে পারব না।

মার্শাল সাহেব বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো করেই চালান।

বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস একদিন কাজে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেন, 'বাবা, আমি তো মাসে ৫০ টাকা করে মাইনে পাচ্ছি। আপনি আর পরিশ্রম করছেন কেন। আপনি এখন বীরসিংহে ফিরে যান। বিশ্রাম করুন। আমি বাড়িতে মাসে মাসে টাকা পাঠাব।'

ছেলের পরামর্শে ঠাকুরদাস চাকরি ছেড়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর মাসে মাসে বাড়িতে ২০ টাকা করে পাঠাতেন। বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাসায় নিজের দুইভাই, খুড়তুতো পিসতুতো চারভাই, আত্মীয়স্বজন আশ্রিত মিলে ১০/১২ জন থাকত। বাকি ৩০ টাকায় এতজনের খরচ নির্বাহ করেও তিনি দু হাতে দান করতেন। মানুষের সেবাযত্ন করতেন।

www.amarboi.org

বিদ্যাসাগরের এক সাহেব ছাত্র এসেছেন, তার নাম রবার্ট কস্ট।

কস্ট তার শিক্ষককে খুব ভালোবাসতেন, মাঝেমধ্যে দুজনে নানা গল্পগুজব করতেন।

কস্ট বললেন, গুরুমহাশয়, আপনি তো সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে জানেন, আমাকে নিয়ে শ্লোক রচনা করে দিন না!

বিদ্যাসাগর তাকে নিয়ে দুটো পদ রচনা করে দিলেন খানিক ক্ষণের মধ্যেই।

কস্ট সাহেব বললেন, বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি এই দুইশ' টাকা সম্মানী আপনাকে নিবেদন করতে চাই।

বিদ্যাসাগর বললেন, আমাকে টাকা দিতে হবে না। আপনি এই টাকাটা সংস্কৃত কলেজে দান করুন। তারা আপনার নামে একটা পুরস্কার প্রবর্তন করুক। যে ছাত্র সংস্কৃত কবিতা বা রচনা লেখা প্রতিযোগিতায় ভালো করবে তাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ৪ বছর এই পুরস্কার তাহলে দেওয়া যাবে।

তাই হলো। কস্ট সাহেবের পুরস্কার নামে এই পুরস্কারটা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্যে চালু করা হলো। দ্বিতীয় বছর এই পুরস্কারের জন্যে বিদ্যাসাগরের ছোটভাই দীনবন্ধুও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। তার লেখা খুবই ভালো হয়েছিল। আর ভালো হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র নামের আরেকজনের লেখা। শ্রীশ ব্যাকরণে ভুল করেছে, দীনবন্ধু তাও করেনি। তবু বিদ্যাসাগর শ্রীশকেই পুরস্কারটা প্রদান করা সঙ্গত বলে মনে করলেন। নিজে পরীক্ষক হয়ে নিজের ভাইকে পুরস্কার দেওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছোটভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে। মা তাকে চিঠি লিখে আদেশ করেছেন বাড়ি আসতে। অথচ কলেজে অনেক কাজ। মার্শাল সাহেব তাকে ছুটি দিতে চাইলেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাইয়েরা আর আত্মীয়বর্গ সবাই বাড়ি গেছে। কলকাতার বাসায় তিনি এখন একা। বর্ষাকাল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। একা বাসায় তার মনে হচ্ছে, মায়ের আদেশ তিনি কীভাবে অমান্য করবেন ? পরের দিন কলেজে গেলেন ফের। মার্শাল সাহেবকে বললেন, মায়ের আদেশ,

www.amarboi.org

আমাকে পালন করতেই হবে। আপনি যদি ছুটি না দেন, তাহলে আমি আর চাকরি করব না, আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন। মার্শাল সাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা, চাকরি ছাড়তে হবে না, আপনি যান।

ঈশ্বরচন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন বীরসিংহ গ্রামের উদ্দেশে। ততদিনে হাঁটার ব্যাপারে তিনি ওস্তাদ হয়ে পড়েছেন। বৃষ্টিভেজা পথও তাকে দমাতে পারল না। এক সন্ধ্যায় তিনি দামোদর নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু নৌকা অন্য তীরে বাঁধা। আগামীকালের আগে আর নৌকা আসছে না। ঘাটে আরও অনেকেই নৌকার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঈশ্বরচন্দ্র যদি আরেক রাত অপেক্ষা করেন, তাহলে বিয়ের আগে পৌঁছানো যাবে না। তিনি সেই বর্ষাকালের ভরা নদীতে ভর সন্ধ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘাটে সবাই হায় হায় করে উঠল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ঠিকই সাঁতরে নদীর অপর পারে উঠতে সক্ষম হলেন।

ভোর হওয়ার আগেই তিনি বাড়িতে হাজির, মা, মা আমি এসেছি।

এই কাহিনী বিভিন্ন বইয়ে লেখা। তবে যার বিয়ে, বিদ্যাসাগরের ছোটভাই সেই শম্ভুচন্দ্র পরে লিখেছেন, দামোদর নদী পার হওয়ার এই গল্প সত্য নয়। কারণ এত বড় নদী সাঁতরে পার হওয়া বর্ষাকালে অসম্ভব।

তবু বিদ্যাসাগর যে মায়ের আদেশ পালন করতে ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন, তা মিথ্যে নয়। আর বিদ্যাসাগর যে একগুঁয়ে এড়েবাছুর, তার পক্ষে সাঁতরে নদী পার হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগর কাজ করছেন, আর ওদিকে ১৮৪৪ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলায় বাংলা-বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেন। চার বছরে ৪০০ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ডে যে-রকম স্কুল আছে, সেই রকমভাবে আধুনিক করে গড়ে তোলা হয় এই বাংলা-স্কুলগুলোকে।

www.amarboi.org

বিদ্যাসাগর এই কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। স্কুলে বাংলা পড়ানো হবে, বিদ্যাসাগরের উৎসাহের কোনো সীমা ছিল না।

এরই মধ্যে তিনি বাংলায় বই লেখা শুরু করে দিয়েছেন। বাসুদেব চরিত নামের একটি বাংলা বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি রচনা করেছিলেন, অবশ্য বইটি প্রকাশিত হয়নি।

বিদ্যাসাগর কলেজের কাজ করছেন, বই লিখছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সাহায্য করছেন, কিন্তু এর মধ্যে থেমে নেই তার সেবামূলক কাজ। কলেজের এক অধ্যাপকের কলেরা। ছুটে গেলেন বিদ্যাসাগর। ডেকে আনলেন ডাক্তার। রোগীর পাশে সারাক্ষণ তিনি দণ্ডায়মান। কখন তার কী দরকার হয়। রোগীর বিছানাপত্র পরিষ্কার করার দায়িত্ব তিনিই পালন করছেন। ওষুধপত্রের দামও তিনিই দিচ্ছেন।

একবার এক বাড়ির কাজের লোকের কলেরা হয়। মনিব তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে। খবর পেয়ে ছুটে যান বিদ্যাসাগর। ওই গরিব অসহায় মানুষটাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তার সেবাযত্ন করেন। লোকটি আরোগ্য লাভ করে।

এমনভাবে কত মানুষের যে সেবাযত্ন বিদ্যাসাগর করেছিলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

বিদ্যাসাগর বেতন পান ৫০ টাকা। এরই মধ্যে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের পণ্ডিতের পদ খালি হয়। এই পদে বেতন ৯০ টাকা। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন ওই পদে যোগ দিতে। বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমি তো একটা চাকরি করছি। আমার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি আছেন, তাকে ওই পদে নিয়োগ দেওয়া উচিত। তার নাম তারানাথ।'

বিদ্যাসাগর তারানাথের গুণ বর্ণনা করলেন। মার্শাল সাহেব বললেন, তিনি কি ওই পদে যোগ দিতে রাজি হবেন?

তারানাথ থাকেন গ্রামে। অনেক দূরের পথ। বিদ্যাসাগর চললেন তারানাথকে রাজি করাতে। নিজে গিয়ে তার কাগজপত্র সব জোগাড় করে এনে জমা দিয়ে তার নিয়োগ অনুমোদন করালেন।

www.amarboi.org

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজের বেতন বাড়ানোর এই সুযোগ কেউ এইভাবে অন্যের হাতে তুলে দেয়?

বিদ্যাসাগরের পক্ষেই একমাত্র এটা করা সম্ভব।

সংস্কৃত কলেজে অবশ্য যোগ দেওয়া হলো তাঁর। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিলেন। মার্শাল সাহেবই এই পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগের জন্যে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজেই বিদ্যাসাগর নিজে ছাত্র ছিলেন। আজ তিনি সেখানে যোগ দিয়েছেন অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হিসেবে।

এই কলেজের জন্যে তার ভালোবাসা গভীর। আবার কলেজে কী ভালো, কী খারাপ, সেটাও তিনি জানেন খুব ভালো করে।

কলেজের কোনো কোনো শিক্ষক ক্লাসে এসে চেয়ারে বসে ঘুম দেন আর ছাত্রদের বলেন বাতাস করতে। শিক্ষকরা কলেজে আসেন নিজের ইচ্ছামতো, চলেও যান মর্জিমাফিক। ছাত্ররাও যখন তখন ক্লাসের বাইরে চলে যায়। বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দিয়ে এইসব অনিয়ম উঠিয়ে দিলেন। নিয়ম করা হলো, সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে কলেজে আসতে হবে। সেক্রেটারির অনুমতি না নিয়ে কেউ যখন ইচ্ছা তখন বাড়ি যেতে পারবে না।

এই সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কার সাহেব। একদিন কোনো একটা প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর গেছেন কার সাহেবের চেম্বারে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কার সাহেব বিদ্যাসাগরকে বসতে বললেন না। তিনি চেয়ারে বসে ছিলেন টেবিলের ওপরে জুতোসহ দুই পা তুলে দিয়ে। তেমনি বসে রইলেন। বিদ্যাসাগর তার কাজ শেষ করে ফিরে এলেন। কিন্তু তার মনে ঠিকই বাজল এই অপমানটা।

কার সাহেবও একদিন কী একটা কাজে এলেন বিদ্যাসাগরের কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে। এই সুযোগ। বিদ্যাসাগর চটি জুতোসমেত দুই পা তুলে দিলেন টেবিলের ওপরে। কার সাহেব কী জন্যে এসেছেন জানতে চেয়ে তার জবাব দিলেন।

www.amarboi.org

কার সাহেব খুবই অপমানিত বোধ করলেন। ফিরে গিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন সরকারের শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের কাছে।

ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন।

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, আমরা অসভ্য, সাহেবরা সভ্য, সাহেবদের কাছেই আমাদের সভ্যতা শেখা উচিত। কার সাহেবের কক্ষেও আমি গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে যেরকমভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম সেইটাই অভ্যর্থনা জানানোর রীতি, কাজেই তিনি যখন আমার কক্ষে এলেন, ঠিক একই রকমভাবে আমি তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। এ জন্যে যদি আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে সেজন্যে কার সাহেবই দায়ী।'

বিদ্যাসাগরের কথায় ময়েট সাহেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি কার সাহেবকে বললেন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মীমাংসা করে নিতে। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে আপস-মীমাংসা করে নিলেন।

সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন রসময় দত্ত। আর বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদক।

সংস্কৃত কলেজের কীভাবে উন্নতি করা যায়, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর একটা পরিকল্পনা তৈরি করেন। অনেক খেটেখুটে যত্ন করে এটা তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। মার্শাল সাহেবকে এই পরিকল্পনাটা তিনি দেখিয়েছিলেন। মার্শাল সাহেব এই পরিকল্পনাটার খুব প্রশংসা করেছিলেন।

কিন্তু সম্পাদক রসময় দত্ত পরিকল্পনাটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি শিক্ষা পরিষদে পরিকল্পনাটা পাঠানোর সময় কেটেকুটে তারপর পাঠালেন।

ঈশ্বরচন্দ্র খুবই একগুঁয়ে মানুষ। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেদন করলেন।

সংস্কৃত কলেজের ১৩ জন অধ্যাপক একযোগে সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত পাঠালেন যেন ঈশ্বরচন্দ্রের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা না হয়।

www.amarboi.org

কিন্তু শেষতক তিনি চাকরিটা ছেড়েই দিলেন।

তার কলকাতার বাসায় তখন আত্মীয় ২০ জন ছেলে আশ্রিত আছে, তারা সেখানে খায়দায়, লেখাপড়া করে। তিনি তাদের কাউকেই বিদায় করলেন না।

ময়েট সাহেবের এক ইংরেজ বন্ধুকে বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত, বাংলা আর হিন্দি পড়াতেন। এই ইংরেজ ছাত্র তার শিক্ষককে ৫০ টাকা দিতে চাইলেন, টাকা বের করলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন, আপনি ময়েট সাহেবের বন্ধু, আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না।

৭

লোকে বলাবলি করতে লাগল, ঈশ্বর যে চাকরি ছেড়ে দিল, ও খাবে কী?

শুনে তিনি বললেন, 'বলে দাও ঈশ্বরচন্দ্র আলু-পটল বেচবে।'

না, আলু-পটল বেচতে হয়নি।

একটা ছাপাখানা বসালেন ঈশ্বরচন্দ্র। ছশ টাকা ঋণ করে। নাম হলো সংস্কৃতযন্ত্র। ছশ টাকা ঋণ কীভাবে শোধ করা যাবে? এগিয়ে এলেন ওই মার্শাল সাহেবই। ছাত্রদের পড়বার জন্যে পাঠ্যবই নেই। অন্নদামঙ্গল বইটা ছাপিয়ে দিন। আমি কিনে নেব ১০০ কপি। ৬০০ টাকা দাম দেব। এইভাবে ঋণ শোধ হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও বই লিখলেন। প্রকাশ করলেন। হিন্দি 'বৈতাল পঁচ্চিসি' বইয়ের অনুবাদ বের করলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে।

১৮৪৯ সালে আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার আর কোষাধ্যক্ষ হলেন তিনি। ১৮৫০ সালে ফের ফিরে এলেন সংস্কৃত কলেজে। প্রথমে হলেন সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক। ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রোমোশন পেলেন। বেতন ১৫০ টাকা। অনেক টাকা।

www.amarboi.org

কিন্তু বিদ্যাসাগরের চলনে-বলনে যে সরলতা ছিল, সাদাসিধে ভাব ছিল, সেটা মোটেও তিনি বিসর্জন দিলেন না।

বীরসিংহ গ্রামে যেতে হলে হেঁটেই যান। সেই ৬০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। শুধু হেঁটে যান তাই নয়। মাথায় করে মালপত্র বহন করে নিয়ে যান। একদিন এমনি করে মাথায় একটা বোঝা চাপিয়ে তিনি ফিরছেন। পথে কলেজের দুজন পিয়নের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারা খুবই অনুরোধ করল বোঝাটা তাদের হাতে দেওয়ার জন্যে। বিদ্যাসাগর কিছুতেই সেটা পিয়নের হাতে তুলে দিলেন না।

শুধু নিজের বোঝা নিজে বইতেন তা নয়, অন্যদের বোঝাও টানতেন। একদিন বীরসিংহ যাওয়ার পথে দেখলেন, একজন বুড়ো মানুষ একটা বড় বোঝা নিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

কী ব্যাপার?

বৃদ্ধ ছেলের সঙ্গে থাকতেন। ছেলে তাকে জিনিসপাতিসহ বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। তিনি এখন তাঁর বাড়ির পথে চলেছেন। শুনে বিদ্যাসাগরের চোখে জল চলে এল। কোথায় আপনার বাড়ি? চলুন আমি আপনাকে দিয়ে আসছি। বৃদ্ধের বোঝা আপন কাঁধে তুলে নিয়ে বিদ্যাসাগর কয়েক মাইল হেঁটে বৃদ্ধকে তার বাড়িতে পৌছে দিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অবিরাম কাজ করে যেতে লাগলেন যাতে প্রতিষ্ঠানটার উন্নতি হয়।

তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন বন্ধুর মতো করে। তাদেরকে ডাকতেন 'তুই' বলে। তাদেরকে মিষ্টি-মিঠাই কিনে খাওয়াতেন। ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া ছিল তার একেবারেই অপছন্দ। একদিন কলেজে দেখতে পেলেন, এক অধ্যাপক ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, কী হে, তুমি কি যাত্রাদল খুলবে নাকি, তাই ছেলেদের রিহার্সাল করাচ্ছ, তুমি নিজে কী সাজবে? দূতী?

অধ্যাপক লজ্জিত বোধ করলেন।

আরেক অধ্যাপকের হাতে তিনি দেখতে পেলেন বেত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হে, হাতে বেত কেন?

www.amarboi.org

অধ্যাপক জবাব দিলেন, ম্যাপ দেখাতে সুবিধা হয়।

'রথও দেখা হয়, কলাও বেচা হয়। মাঝে-মধ্যে ছাত্রদের পিঠেও পড়ে।'

তার ছোটবেলায় তার বাবা তাকে সনাতন পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়াননি একটিমাত্র কারণে যে এই পণ্ডিত ছেলেদের কঠিন শাস্তি দেয়। আর আজ বড় হয়ে তিনি যেই কলেজের অধ্যক্ষ সেখানে বেত চলবে, এটা তিনি মানতে পারবেন কী করে?

এই রকম নানা চেষ্টায় কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ আধুনিক আর উন্নত হতে লাগল।

এরপর কলেজটাকে একটু ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করলেন তিনি। সরকারের কাছে পাঠালেন তার সুচিন্তিত রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট তৈরির আগে সবার সঙ্গে কথা বলে নিলেন। এমনকি ছাত্ররাও জানাল তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। তিনি বললেন, এমন এক শ্রেণীর মানুষ তারা তৈরি করতে চান, যারা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবে, কিন্তু হয়ে উঠবে আধুনিক মানুষ, সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি মুখ ফুটে বললেন, সাংখ্য-বেদান্ত ভুল দর্শন। কপিল মুনি আর বেদব্যাস রচিত দর্শন ভুল! এই কথা বলা তখন কি সহজ ছিল!

আগে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকত চাঁদের তিথি ধরে, প্রথম তিথিতে আর অষ্টমী তিথিতে। কারণ, তখন মনে করা হতো, এই দুদিন সংস্কৃত পড়া উচিত নয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠানে এইসব কুসংস্কার চলবে না। তিনি তার বদলে রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন করে দিলেন কলেজে।

এইসব নিয়ে গোঁড়া পণ্ডিতরা আড়ালে সমালোচনা করতেন, বিতর্ক করতেন। কিন্তু হইচই তৈরি হলো তখন, যখন তিনি বললেন, সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণরা পড়তে পারবে, অন্য কোনো বর্ণের লোকেরা পড়তে পারবে না, এটা কেন হবে। বিদ্যায় সব শ্রেণী-পেশা বর্ণগোত্রের লোকেরই সমান অধিকার থাকতে হবে।

পণ্ডিতেরা মার মার বলে ছুটে এলেন। কী বলে! জাতিভেদ থাকবে না? বর্ণভেদ থাকবে না?

www.amarboi.org

বিদ্যাসাগর যুক্তি দিলেন। বললেন, টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের তো দিব্যি সংস্কৃত শেখানো হচ্ছে। তাহলে অন্যেরা পারবে না কেন? আর টাকার বিনিময়ে তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কায়স্থ রাজা বা জমিদারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তখন পাপ হয় না? কায়স্থের ছেলের যদি শাস্ত্রে অধিকার না থাকবে, তাহলে রাজা রাধাকান্ত দেবকে কেন পণ্ডিতরা সংস্কৃত আর শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি রাজা বলে? ভালো টাকা পাওয়া গেছে বলে? এই সেদিন পর্যন্ত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন রসময় দত্ত, তখন কি কলেজ অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল। আর এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে, পরিচালনা করছে ইংরেজ রাজপুরুষরা, তাদের কথামতোই তো সব চলছে, তাতে কলেজ অপবিত্র হয়নি? ব্রাহ্মণকে আপনারা বর্ণশ্রেষ্ঠ বলেন, এই কি শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভেদ বজায় রাখা?

বিদ্যাসাগরের যুক্তির কাছে পরাজিত হলেন বিরোধীরা। তারা মেনে নিলেন কলেজে সব বর্ণের ছাত্রই পড়তে আসতে পারবে।

৮

সরকারের শিক্ষা বিভাগের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বীট্‌ন সাহেব। বেথুন সাহেব নামেই তিনি এখনও পরিচিত। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে তিনি ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন দি হিন্দু ফিমেল স্কুল। বিদ্যাসাগর হলেন এই স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারি। তিনি মেয়েদের তো সেই ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তার মা, তার ঠাকুরমা আর গোপালের মা রাইমণির ভালোবাসা ও স্নেহের কথা তিনি ভুলবেন কী করে! আর তার বাবা ঠাকুরদাস যখন খিদেয় কাতর হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরছিলেন, তখন যে একজন মুড়িওয়ালি তাকে পরম যত্নে ফলার খাইয়েছিল, সে কথাও তো চিরদিন স্মরণ করে এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তিনি জানেন, মেয়েরা বড় পিছিয়ে আছে, মেয়েরা বড় দুখী, তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, শিক্ষাই পারে মানুষের জীবনটাকে পাল্টে দিতে।

www.amarboi.org

বেথুন সাহেব তো মেয়েদের জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু সেই স্কুলে ছাত্রী নেই। মেয়েদের কেউ স্কুলে দিতে চায় না। বিদ্যাসাগর লেগে পড়লেন স্কুলে ছাত্রী জোগাড় করার জন্যে। শাস্ত্র ঘেঁটে বের করলেন 'কন্যাপ্যেং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'। নিজের মেয়ে থাকলে তাকেই দিতেন স্কুলে। নিজের মেয়ে নেই, সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মেয়ে আছে। তাকে বললেন, তোমার মেয়েটিকে এই স্কুলে ভর্তি করাও।

রাজি হলেন মদনমোহন। তাঁর মেয়েকে ওই স্কুলে ভর্তি করানো হলো। এরপর আরও দুচারজন তাদের মেয়েকে স্কুলে পাঠালেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, মেয়েদের স্কুলের জন্যে একটা গাড়ি চাই। সেই গাড়ি মেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়া করবে। গাড়ি হলো। তার গায়ে লেখা রইল মনুসংহিতার সেই শ্লোক : 'কন্যাপ্যেং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'।

আস্তে আস্তে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা তাদের মেয়েকে স্কুলে দিতে শুরু করল। কিন্তু সমাজে তাদের বিরোধিতাও হতে লাগল অনেক। নানা মন্দ কথা ছড়াতে লাগল দুষ্টু লোকেরা। ছড়া কাটতে লাগল। এমনকি আত্মীয়স্বজনরাও মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে চলল।

বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে কলকাতায় এগিয়ে চলল মেয়েদের স্কুলের কাজ।

বাধা তো আসবেই। শহরেই এই রকম বাধা, গ্রামে না জানি আরও কত বাধা আসবে। ভদ্রলোকেরা তাদের মেয়েদের কিছুতেই স্কুলে দিতে চাইবেন না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রও তো ছেলেবেলা থেকেই একগুঁয়ে, এঁড়েবাছুর নাম ছিল তার। যে কাজে বাধা আসে, সেই কাজেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রবল উৎসাহে।

বীরসিংহ গ্রামে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন অবৈতনিক স্কুল, যাতে গরিবরা পড়াশোনা করতে পারে। স্কুলের জন্যে জমি কিনলেন। জঙ্গলে ভরা সেই জমি। জঙ্গল কাটতে হবে। মাটি কেটে জমি সমান করতে হবে। মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বরচন্দ্র তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে নিজে কোদাল হাতে ধরলেন। জঙ্গল সাফ হয়ে

www.amarboi.org

গেল। এরপর স্কুল ভবন বানাতে হবে। কলকাতায় ফেরার আগে বাবার হাতে তিনি দিয়ে এলেন হাজার টাকা।

যারা দিনের বেলা স্কুলে আসতে পারে না, তাদের জন্যে বানালেন নৈশ বিদ্যালয়। এ ছাড়া এই গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়, রাখাল বালকদের জন্যে বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন তিনি। সবই নিজের টাকায়।

১৮৫৫ সালে তাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের বাইরে দক্ষিণ বাংলার স্কুলগুলোর সহকারী পরিদর্শকের পদও দেওয়া হয়। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারির মধ্যেই দক্ষিণ বাংলার চার জেলায় ২০০ স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ সালে তাঁকে সহকারী স্কুল পরিদর্শক থেকে বিশেষ পরিদর্শকের পদ দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে তৈরি হলো একটি মেয়েস্কুল। শুধু তাই নয়, ৭ মাসের মধ্যে তিনি নানা জায়গায় স্থাপন করলেন ৩৫টি মেয়েদের স্কুল। স্কুলগুলো তিনি শুরু করলেন নিজের দায়িত্বে। নিজের খরচে।

বাংলা স্কুল তো হচ্ছে। কিন্তু সেসবে কে পড়াবে? তিনি নিজে পরীক্ষা নিয়ে নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিলেন। সব শিক্ষক যে পরীক্ষায় ভালো করল তা নয়। তখন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠান গড়লেন। নরমাল স্কুল।

এই শিক্ষক প্রশিক্ষণশালা খোলার পেছনেও গল্প আছে।

স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বিদ্যাসাগর গেছেন এক গ্রামের স্কুলে। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে দেখলেন, ছেলেরা বাংলা আর অঙ্ক ভালোই শিখেছে। এবার তিনি উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীর গতি কয় রকম? দিন-রাত্রি কেন হয়?

ছেলেরা জবাব দিল, 'পৃথিবীর কোনও গতি নেই। পৃথিবী স্থির। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তাই দিন আর রাত হয়।'

সব ছেলে একই জবাব দিচ্ছে। বিদ্যাসাগর তখন পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে তাকালেন। আপনি কী বলেন পণ্ডিত মশাই। পৃথিবী ঘুরছে, নাকি স্থির হয়ে আছে।

পণ্ডিত মশাই জবাব দিলেন, পৃথিবীকে তো স্থিরই দেখছি। ও আবার ঘুরছে কবে থেকে?

www.amarboi.org

না, বিদ্যাসাগর বললেন, দুরকম গতি আছে পৃথিবীর, আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি, নিজের মেরুপথে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে, তাই দিন আর রাত হয়, এটা আহ্নিক গতি, আর সূর্যের চারপাশে পৃথিবী বছরে একবার ঘুরে আসে, তাই পৃথিবীতে ঋতুবদল হয়।

পণ্ডিত মশাই বললেন, তা ঘুরুক না পৃথিবী। আমি তো তাকে বাধা দিতে যাচ্ছি না। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়।

পণ্ডিত মশাই নিজেই যদি ভুল জানেন, তাহলে তিনি ছাত্রদের শেখাবেন কী?

ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজেই নরমাল স্কুল খোলা হলো, যেখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলতে থাকল।

স্কুল হচ্ছে। শিক্ষকও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কী পড়ানো হবে সেসব স্কুলে? বাংলা কোনো বই-ই তখন রচিত হয়নি, যা স্কুলে পড়ানো যায়। তিনি নিজে লিখতে বসে গেলেন *বর্ণপরিচয়* বা *কথামালা*। ইংরেজি *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল* অবলম্বন করে লিখলেন *বাঙ্গালার ইতিহাস*। বড়মানুষদের জীবনীর বইও অনুবাদ করলেন, নাম দিলেন জীবনচরিত।

সরকারের সঙ্গে তখন তার ভালো যোগাযোগ। লে. গভর্নর হ্যালিডে তাকে মৌখিক অনুমতি দিয়েছিলেন মেয়েদের ৩৫টি স্কুল করবার। এই ছোটলাটের সঙ্গে ঈশ্বরের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন, সরকারি বড় বড় অনুষ্ঠানে আসার সময় উপযুক্ত পোশাক পরে আসতে। সে কারণে ঈশ্বরচন্দ্র দুই একবার চোগা-আচকান পরে গিয়েছিলেন ছোটলাটের কার্যালয়ে। কিন্তু এই পোশাক তিনি মোটেও অন্তর থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। শেষে বলেই বসলেন, 'আমাকে যদি এই পোশাক পরে আসতে হয়, তাহলে আজকেই শেষ, আমি আর এখানে আসতে পারব না।' হ্যালিডে তাকে অনুমতি দিলেন তার অভ্যস্ত পোশাকই পরে আসতে। এরপর থেকে আবার সেই সাদা ধুতি আর চাদর, পায়ে চটি।

আশা ছিল ৩৫টি মেয়েস্কুলের ব্যাপারে পরে সরকারি সাহায্য পাওয়া যাবে। সেই সাহায্য পাওয়াটা সহজ হলো না। কারণ

www.amarboi.org

একজন ইংরেজ ডব্লু জি ইয়ং নতুন নিয়োগ পেয়েছিলেন শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হিসেবে। তিনি বললেন, ৩৫টি স্কুলের কোনো সরকারি অনুমতি নেই, এগুলোর ব্যয়ভার সরকার বহন করবে না।

যদিও লেফটেন্যান্ট গভর্নর চেষ্টা করলেন যেন সরকার এগুলোর দায়িত্ব নেয়, কিন্তু নানা জটিলতা সৃষ্টি হলো।

বিদ্যাসাগরও দমবার পাত্র নন। তিনি সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। এবার তাঁর মাথার ওপরে কেউ ছড়ি ঘোরাতে পারবে না। এবার তিনি স্বাধীন। তবে স্কুলগুলোও বন্ধ হবে না। তিনি সবগুলো স্কুলই চালাবেন। সব শিক্ষক বেতনও পাবে। যেভাবেই হোক, তিনি খরচ জোগাড় করবেন। যখন তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে চাইলেন, লেফটেন্যান্ট গভর্নর জিজ্ঞেস করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে খাবে কী?

ঈশ্বর এর আগেরবার চাকরি ছাড়ার সময় একই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আলু-পটল বেচে খাব।' এবার বললেন, 'ডালভাত'।

'তাই বা জুটবে কোত্থেকে?'

'দুবেলা না জোটে, একবেলা খাব। তাও না জোটে, একদিন অন্তর খাব। তাই বলে যে-কাজে মন বসছে না, সে-কাজ করতে পারব না।'

শুধু স্কুল নয়, এবার কলেজ। প্রথমেই কলেজ করা যাবে না। তাহলে ধাপে ধাপে হোক। তিনি যোগ দিলেন ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালনামণ্ডলীতে। ১৮৬৪ সালে ওই স্কুলের নাম বদলে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট করা হলো। ওই স্কুলে বিএ পড়ানোর অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। আবেদন মঞ্জুর হলো না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র দমে গেলেন না।

ছাত্ররা রেজাল্ট করতে লাগল খুবই ভালো। আবার আবেদন জানানো হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। এবার অনুমোদন পাওয়া গেল। বিএ পড়ানো শুরু হলো ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে।

হ্যাঁ, এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। কলেজ ভবন তৈরি করতে তিনি ব্যয় করেছিলেন দেড় লক্ষ টাকা। এটা তিনি জোগাড় করেছিলেন ঋণ করে।

www.amarboi.org

এই কলেজটাকে তিনি আমৃত্যু ভালোবেসে গেছেন। ভালোবেসেছেন তার ছাত্রদের, শিক্ষকদের। ছাত্রদের বাসায় ডেকে আনতেন, নিজের সংগ্রহের বই দিতেন, শিক্ষকদের ডেকে আনতেন নিজের কাছে, ফলমূল কেটে খাওয়াতেন। যখন তিনি বেশ অসুস্থ, তার জীবনের শেষ দিনগুলোয়, চলাফেরা করতে অসুবিধা হতো, তখনও টুকটুক করে হেঁটে যেতেন কলেজে। এ যেন তার নিজের সন্তানের মতো।

এখন ওই কলেজটা বিদ্যাসাগর কলেজ নামে বিখ্যাত।

৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি হলো বাংলাভাষা। 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন' —এই মত রবীন্দ্রনাথের। ১৮০০ সালের আগে বাংলা গদ্য বলতে তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে বাংলা গদ্য প্রচলন করে। তার আগে চিঠিপত্রে, দলিলে কিছু কিছু বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় বটে, সেগুলো খুব মজবুত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন, বক্তব্য সরল করে এবং সুশৃঙ্খল করে বলতে হয়। এর আগে বাংলায় অকারণ সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দ ছিল। বিদ্যাসাগর সেগুলো আলাদা আলাদা শব্দে ভাগ করে ব্যবহার করেন। একটা পদের পরে আরেকটা পদ কী নিয়মে ব্যবহার হবে, তাও তিনি দেখিয়ে দেন।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' এইসব অনুবাদ বই তিনি রচনা করেছেন। শেক্সপিয়র থেকে 'কমেডি অব এররস'-এর অনুবাদ করলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'। ছোটদের জন্যে লিখেছেন 'বর্ণপরিচয়'। এই বই এখনও পাওয়া যায়। বাংলা বর্ণমালা শেখার জন্যে এখনও ছেলেমেয়েরা এই বই দিয়ে জীবন শুরু করে। 'বোধোদয়' আর 'কথামালা'ও ছোটদের জন্যে লেখা ছোট ছোট উপদেশমূলক গল্পের বই। কথামালা বইয়ে ঈসপের গল্প থেকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

www.amarboi.org

তাঁর 'বাঘ ও বক', 'দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ', 'ব্যাঘ্র ও মেষশাবক' এইসব গল্প এক সময় সবার মুখে মুখে ফিরেছে।

'বাঘ ও বক' গল্পটা এখানে তুলে ধরা যাক :

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘের বিস্তর তেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি তোমার বিলক্ষণ পুরস্কার দিব এবং চিরকালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোন জন্তুই ভয়ে সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল এবং বাঘের মুখের ভিতর, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবা মাত্র, সে, দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, অরে নির্বোধ! তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা; নতুবা, এখনই, তোর ঘাড় ভাঙিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

আরেকটা গল্প এখানে তুলে ধরা যাক।

জলমগ্ন বালক

এক বালক পুষ্করণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার উপক্রম হইল। দৈবযোগে সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, কাতরবাক্যে বলিল, ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমায় তুলুন। নতুবা ডুবিয়া মরি। তিনি অগ্রে তাহাকে জল হইতে না উঠাইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বালক বলিল,

www.amarboi.org

আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভর্ৎসনা করিলে ভাল হয়। আপনার ভর্ৎসনা করিতে করিতে আমার প্রাণত্যাগ হয়।

বিদ্যাসাগর সারা জীবনে ৫০টিরও বেশি বই রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে মৌলিক গ্রন্থ আছে, অনুবাদ আছে, পাঠ্যবই, ব্যাকরণ বই আছে, সম্পাদিত গ্রন্থও আছে। আগে বাংলা ভাষায় দাঁড়ি আর দুই দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হতো না, বিদ্যাসাগরের আগে এক-আধজন সেই চেষ্টা করেছেন, বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষার আদলে যতিচিহ্ন ব্যবহার করে এই নিয়মটাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এসব কারণেই তাকে অনেকেই বাংলা গদ্যের জনক বলে অভিহিত করেন।

বিদ্যাসাগরের অনেক বই খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল আর সেসব থেকে তিনি অর্থও আয় করতেন। সে কারণেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে ভয় পাননি।

১০

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের এক খেলার সাথী ছিল। তাদের কোনো প্রতিবেশীর কন্যা। ছোটবেলায় তারা একসঙ্গে খেলতেন, অনেকটা সময় কাটাতেন। তারপরে তো আট বছর বয়সেই বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় কলকাতায়। এর মধ্যে মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়েটি বিধবা হয়ে ফের গ্রামে ফিরে আসে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছুটিতে বাড়ি এলে প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে যেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, কে কী খেল না খেল। এই তুই কী খেয়েছিস? তিনি তার বাল্যসখীকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কী খাব? আজ একাদশী না? আজ আমার উপোস?

উপোস? কেন?

ওমা। তুমি জানো না বিধবাদের একাদশীর দিনে কিছু খেতে নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদতে লাগলেন। তার বয়স তখন ১৩/ ১৪ বছর। তিনি মনে মনে বললেন, 'যদি বেঁচে থাকি, বিধবার এই দুঃখ আমি দূর করব।'

www.amarboi.org

তাঁর শিক্ষক বাচস্পতি যখন একটা বালিকা বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল, একদিন তিনি সেই বাড়িতে আর কখনও অন্নজল স্পর্শ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বাচস্পতি অল্পদিনের মধ্যেই মারা গিয়ে মেয়েটিকে বিধবা করে চির দুঃখে দুঃখী করে গেছেন।

ওই সময় মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো অতি অল্প বয়সে। আবার বুড়োরাও খুবই অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করত। অল্প দিনের মধ্যেই বুড়ো স্বামী মরে গিয়ে এই বালিকাদের অগাধ জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেত। তাদের কোনো অবলম্বন থাকত না। তারা বাপের বাড়িতে এসে অনেক অনাদর অসম্মানের মধ্যে দিন কাটাত। খেতে পেত না, পরতে পেত না। নানা সংস্কার ছিল। বিধবারা এটা খেতে পারবে না, ওটা খেতে পারবে না। এই দিন খেতে পারবে না, ওই দিন খেতে পারবে না। প্রায়ই তাদেরকে উপোস করতে বলা হতো। আবার বিধবারা অপয়া বলেই গণ্য হতো। কোনো শুভ কাজের সময় বিধবাদের সামনে আসতে দেওয়া হতো না।

বিধবাদের এইসব দুঃখ দেখে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের প্রাণ উঠল কেঁদে।

কী করা যায় এই বিধবাদের জন্যে? একটা উপায় হলো বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা। তখনকার দিনে বিধবারা আর বিয়ে করতে পারত না।

কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা যায় কীভাবে?

দেশের লোক শাস্ত্র মানে। যদি শাস্ত্র ঘেঁটে বের করা যায় যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তাহলেই কেবল এটা প্রচলন করা সম্ভব হতে পারে।

বিদ্যাসাগর এই চিন্তায় আর ঘুমাতে পারতেন না। নাওয়া-খাওয়াও ভুলে গেলেন। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতেন সারাদিন-রাত। সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে লাগলেন অবিরাম। খুঁজতে লাগলেন কোথায় বিধবা-বিয়ের পক্ষে কোন বচন কোন উদাহরণ পাওয়া যায়। রাতেও তিনি লাইব্রেরিতেই থাকতেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সেখান থেকে কাছে ছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতেন।

www.amarboi.org

একদিন রাজসিংহ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুজন একই ঘরে। দুজনই পড়ছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পড়ছেন *পরাশর-সংহিতা*। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিদ্যাসাগর হঠাৎ আর্কিমিডিসের মতোই বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ?'

'এই দেখো শাস্ত্রেই আছে বিধবাদের বিয়ে দেওয়া যায়।' তিনি শ্লোক আওড়াতে লাগলেন।

বিধবা-বিবাহের পক্ষে তিনি একটা বই রচনা করে ফেললেন।

বইটি লেখা হয়ে গেলে সেটা নিয়ে তিনি হাজির হলেন বীরসিংহ গ্রামে, বাবার কাছে। বাবাকে বললেন, 'বাবা, আমি শাস্ত্র ঘেঁটে বিধবা-বিয়ের পক্ষে এই বইটি লিখেছি। আপনি শুনে এ বিষয়ে মত না দিলে বইটা প্রকাশ করতে পারি না।'

বাবা বললেন, 'যদি আমি এই বিষয়ে সম্মত না হই, তাহলে তুমি কী করবে?'

'আপনি বেঁচে থাকলে আর এই বই প্রকাশ করব না, আপনি যখন থাকবেন না, তখন দেখা যাবে কী করা যায়।'

'আচ্ছা কাল ভালোমতো শুনব। তারপর বলব।'

পরের দিন বিদ্যাসাগর বাবাকে পুরোটা পড়ে শোনালেন। খুব বড় বই নয়। অল্পক্ষণই লাগল। সব শুনে বাবা বললেন, 'তুমি যা লিখেছ, তা কি শাস্ত্রের কথা?'

'আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'তাহলে তুমি এগিয়ে যাও। আমার আপত্তি নেই।'

এরপর বিদ্যাসাগর গেলেন তার মায়ের কাছে। বললেন, 'মা আমি একটা বই লিখেছি। বিধবা-বিয়ের পক্ষে। তোমার মত কী?'

মা বললেন, 'বিধবাদের দুঃখ সহ্য করা যায়? তারা সবখানেই লোকের চোখের বালি। মঙ্গল কাজে বেরুনোর সময় তাদের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়। ঘরে তারা আপদ হিসেবে কুকুরের মতো থাকে। সারাটা জীবন চোখের জলে তারা ভাসে। তাদের সংসারে সুখী করতে চাও। করো। তবে এক কাজ করো। তোমার বাবাকে কিছু বোলো না।'

www.amarboi.org

'কেন মা?'

'উনি হয়তো বাধা দিতে পারেন।'

'উনি তো মত দিয়েছেন।'

'তাহলে আর কী। এগিয়ে যাও।'

বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিধবাদের বিয়েকে স্বাভাবিক শাস্ত্রসম্মত রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে। বের করলেন বই 'বিধবা-বিবাহ'। সে বই বিক্রি হতে লাগল হু হু করে।

এর আগেই কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র পণ্ডিতদের ডেকে বলেছেন বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান বের করে দিতে। আর কলকাতাতেও শ্যামাচরণ দাস নামে এক কর্মকার তাঁর বিধবা মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইছেন, অনুমতি চাচ্ছেন শাস্ত্র-জানা পণ্ডিতদের কাছে।

বিদ্যাসাগরের বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে শুরু হলো হইচই। গোঁড়া পণ্ডিতরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। তারা তাদের যুক্তি দেখাতে লাগল। চারদিকে বাদ-প্রতিবাদ। হইচই। বিধবা-বিবাহবিরোধীরাও বই বের করতে লাগলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন আরেকটা বই লিখলেন বিধবা-বিবাহ নিয়ে। সেটাও বিক্রি হতে লাগল প্রচুর। ভিন্নমত খণ্ডন করে দুটো বই লেখেন 'অতি অল্প হইল' আর 'আবার অতি অল্প হইল' তবে এই দুটো বই লেখেন নাম গোপন করে।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন :

'বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব॥

ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্য বিধবা-বিয়ের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বিধবা-বিবাহের পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের সমর্থনে অনেক গান কবিতা ছড়া লিখিত হতে লাগল।

একটা গান এ-রকম :

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে?

www.amarboi.org

রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে॥

চারদিকে এইরকম গান, পালাগান, ছড়ার ছড়াছড়ি। শান্তিপুরের তাঁতীরা একটা নতুন রকমের শাড়িই বের করে ফেলল, বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি। সেসব শাড়ি বিক্রিও হতে লাগল খুব। অনেকে বেশি দামেও সেই শাড়ি কিনেছেন। সেই শাড়ির পাড়ে লেখা ছিল গান

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর। সুখে থাকুক। এই রব সাধারণের মুখে। কিন্তু তার বিরোধীরাও তো আছে। তারা এই গানের প্যারোডি বের করল : 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।'

বিধবা-বিবাহ আইন চালু করা হোক—এক হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আবেদন জানানো হলো রাজদরবারে। বিরোধীরাও বসে নেই। তারা ত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাল্টা পাঠাল বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে।

পত্রপত্রিকাগুলো বেশির ভাগই অবশ্য লিখতে লাগল বিধবা-বিবাহের পক্ষে।

একদিন বিদ্যাসাগর বর্ধমান থেকে কলকাতা আসছেন ট্রেনে করে। এক স্টেশনে বিদ্যাসাগরের কামরায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উঠলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে চেনেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের নামে অনেক গালমন্দ করলেন। হুগলি স্টেশনে নেমে তিনি জানতে পারলেন তার সামনেই বিদ্যাসাগর বসে ছিলেন। শোনামাত্র পণ্ডিতটি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সে কথা শোনামাত্র বিদ্যাসাগর ছুটে গেলেন তার কাছে। তাকে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। তিনি জ্ঞান ফিরে পেলে বিদ্যাসাগর তাকে কিছু টাকাকড়িও দান করলেন।

www.amarboi.org

বাবার সঙ্গে দেখা হলো বিদ্যাসাগরের। বাবা বললেন, শোনো, যা আরম্ভ করেছ, তা মাঝপথে ছেড়ে দিও না।

ঈশ্বর বললেন, মাঝপথে ছাড়ব, আমি তো সে রকম নই আপনি জানেন। আমি যা আরম্ভ করেছি, তা শেষ করেই তবে থামব।

দীনবন্ধু মিত্র একটা কাহিনী লিখলেন বিধবা-বিবাহের পক্ষে। তাতে একটা গানও রইল :

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো, কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো, বিপক্ষের বল॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো, এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল, দিদী অধর্ম্মের ফল লো, অধর্ম্মের ফল॥
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো, যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো, সব যাবে তল॥

এইসব হই-হল্লা যুক্তি পাল্টা যুক্তির মধ্যে ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে গেল।

আইন তো হলো। কিন্তু শুধু কাগজে আইন থাকলে তো চলবে না। বাস্তব প্রয়োগ চাই।

আইন পাস হওয়ার কয়েক মাস পরে প্রথম বিধবা-বিয়ের আয়োজন চলল। পাত্রীর নাম কালীমতী দেবী। পাত্রের নাম শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিয়ে হচ্ছে বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বিয়ের খরচ দশ হাজার টাকা।

বাড়ির সামনে মানুষের ভিড় লেগে গেল। বাড়ি পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। বিদ্যাসাগর আগে থেকেই পুলিশের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভিড় ঠেলে বর নিয়ে পাল্কি এগোনোই মুশকিল। বর বুঝি একটু ভয় পাচ্ছে। পাল্কির দুপাশে দেশের সেরা মনীষীরা হাঁটছেন, তারা সবাই বিদ্যাসাগরের বন্ধু, তারা অভয়বাণী শোনাচ্ছেন বরকে।

বিয়েতে যা যা হয় সবই হলো। মহাধুমধামে বিয়ে সম্পন্ন হলো। খবরের কাগজে সেই বিয়ের বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশিত হলো। এক কাগজে লিখেছে, ৬০০ লোক আহার করে। আরেক

www.amarboi.org

কাগজে লিখেছে, দুই হাজারের বেশি লোক ভোজন করেছে। সারারাত ধরে চলেছে খাওয়া।

প্রথম বিয়ের আনন্দ যেতে না যেতেই ওই সপ্তাহেই আরেকটা বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এদিকে বিধবা-বিবাহ বিরোধীরা এত ক্ষেপে গেল যে তারা বিদ্যাসাগরকে মারার আয়োজন করতে লাগল। গুণ্ডা ভাড়া করল। শুনে বিদ্যাসাগর নিজেই বেরিয়ে পড়লেন গুণ্ডাদের সন্ধানে। তাদের কাছে গিয়ে হাজির। বললেন, শুনতে পেলাম আমাকে মারার জন্যে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। তারা কষ্ট করে আমার কাছে যাবে, দরকার কী। আমি নিজেই চলে এলাম। এবার কী করতে চান, করুন। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবেন না।

যারা তাকে মারতে চেয়েছিল, তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল।

বিধবা-বিবাহ চালু করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনেক টাকা ঋণ করলেন। কিন্তু তিনি চাননি তার ঋণের বোঝা অন্যে শোধ করুক। তাঁর এক বন্ধু তাঁর জন্যে চাঁদা তুলতে গেলে তিনি তাকে বললেন, আমাকে অপমান করছ কেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের ছেলে নারায়ণ এক বিধবা কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। ঈশ্বরচন্দ্র খুবই খুশি। শুধু অন্যের ছেলেকে বিধবা-বিবাহ করালে তো হবে না। নিজের ঘরেই এটা করে দেখাতে হবে।

আরেক ছেলে শম্ভুচন্দ্র বাবাকে লিখল, আত্মীয়স্বজনরা চান না এই বিয়ে হোক, যদি হয়, তাহলে তারা তাদের সঙ্গে আর আহার-ব্যবহার করবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র জবাব দিলেন, আমি নিজে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক। এ জন্যে যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, তাও আমি দিতে প্রস্তুত। আর আত্মীয়স্বজনরা আহার-ব্যবহার করবে না, সেটা তো সামান্য ব্যাপার। যারা আমাদেরকে বর্জন করতে চায়, করুক। সবাই নিজের ইচ্ছায় চলবে, কেউ কাউকে অন্যের ইচ্ছায় চালাতে পারে না।

www.amarboi.org

নারায়ণ বিয়ে করল। ঈশ্বরচন্দ্র খুবই খুশি হলেন। তাঁর সমালোচকদেরও মুখ চুন হলো। তারা এতদিন বলত, ঈশ্বরচন্দ্র অন্যের ছেলের জাত মারছেন, নিজের ছেলেকে বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিন তো দেখি। এখন তারা আর কী বলবে?

১১

বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তখন দেশের মানুষ আরো একটা কুসংস্কার রোধ করার জন্যে আন্দোলন করছে। তারা সরকারের কাছে আবেদন জানাল বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। সেই আবেদনে কাজ হলো না।

বছর দশেক পরে আবার আবেদন করা হলো যেন বহুবিবাহ রোধ করে আইন পাস করা হয়। আবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এবার লাগলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বই লিখলেন 'বহুবিবাহ'। শাস্ত্রে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, নানা বই খুঁজে খুঁজে সেটাই তিনি তুলে ধরলেন। আর তুলে ধরলেন বহুবিবাহের কুফলগুলো—সমাজের কী কী ক্ষতি হচ্ছে এই বিয়ের ফলে।

ওই সময় হিন্দু সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ নামে একটা জাত ছিল। তারা ১০০টা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারত। কুলীন কন্যাদের আবার কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করতে পারত না। কুলীন ব্রাহ্মণরা বিয়ে করার জন্যে মেয়ের বাবার কাছ থেকে টাকাপয়সা নিতেন। তার ওপর আবার বউকে নিজের বাড়িতে এনে রাখার দরকার পড়ত না। মেয়ে তার বাবার বাড়িতেই থাকত, আর তার স্বামী একের পর এক বিয়ে করে যেত। বিদ্যাসাগর তার বইয়ে দেখিয়েছেন, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক লোক ৫৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন ৮০টি। আরেকজন করেছেন ৭২টি।

এই যে লোকগুলো এতগুলো বিয়ে করেছে, তাদের বউরা সব নিজ নিজ বাপের বাড়িতে থাকে। স্বামী তাদের সঙ্গে দেখা করতে যদি যারেন, সেজন্যেও টাকা দাবি করেন

www.amarboi.org

বাপের বাড়িতে এই বউগুলো কুকুর-বেড়ালের মতো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করে। স্বামীর সঙ্গে সংসার তো তাদের করা হয়ই না, নিজের একটু ভাত-কাপড়ের জন্যেও তাদের ভাইদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় ভাইরা তাদের দায়িত্ব নিতে চায় না। মেয়েগুলো পথে বসে।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের ছোটবেলার গুরুমশাই ছিলেন এই রকম একজন কুলীন। তিনিও একাধিক বিয়ে করেছিলেন।

একদিন ঈশ্বরচন্দ্র গেছেন তাঁর বীরসিংহর বাড়িতে। দেখতে পেলেন, মায়ের কাছে এসেছেন দুজন মহিলা, একজনের বয়স প্রায় ষাট বছর, আরেকজনের বয়স আঠারো-উনিশ।

বিদ্যাসাগর বললেন, মা এঁরা কারা?

মা বললেন, বড়জন তোমার ছোটবেলার পাঠশালার গুরুমশাইয়ের প্রথমা স্ত্রী আর ছোটটি তাদের মেয়ে।

গুরুমশাই বিয়ে করেছেন পাঁচ-ছটি। কিন্তু তিনি কোনো বউকেই নিজের বাড়িতে রাখেন না। কারণ কুলীনরা বউকে খাওয়াতে-পরাতে নিজের কাছে রাখতে বাধ্য নয়। আর মেয়েটি। ওরও বিয়ে হয়েছে আরেক কুলীনের সঙ্গে। সেও বিয়ে করেছে ৪০/৫০টি। কাজেই মেয়েটির স্বামী তার কাছে আসে না। গুরুমশাইয়ের ছেলে এতদিন এদের ভরণপোষণ করত, এখন বলে দিয়েছে, আর পারবে না।

এই দুই নারীর করুণ কাহিনী শুনে বিদ্যাসাগর কাঁদতে লাগলেন।

তিনি এদের জন্যে মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন। গুরুমশাইকে বললেন, মাসোহারা দেব, এদেরকে নিজের কাছে এনে রাখুন।

আর তিনি সরকারের কাছে আবার দরখাস্ত করলেন বহুবিবাহ কুপ্রথা বন্ধ করে আইন পাস করতে।

বই লিখলেন। আবারও তাঁর বই নিয়ে হইচই হতে শুরু করল। পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথাবার্তা চলল। বিরোধীদের মতের জবাব দেওয়ার জন্যে আরেকটা বই লিখতে হলো। শাস্ত্রের কথা লিখলেন, মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন।

www.amarboi.org

এবার কিন্তু আর আইন পাস হলো না। তা না হলো। কিন্তু সমাজে সচেতনতা তৈরি হলো। কৌলীন্য প্রথাটা যে খারাপ, বহুবিবাহ যে ভালো নয়, সেটা আস্তে আস্তে মেনে নিতে লাগল সমাজ।

১২

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ঝড়ো হাওয়ার মতো খেপা-পাগলা বাউন্ডুলে একটা মানুষ। তিনি ফ্রান্সে আছেন ফরাসিনী স্ত্রীকে নিয়ে। হাতে টাকা-পয়সা নেই। জেলে যাবার জোগাড়। স্ত্রী কাঁদছেন, ছেলেমেয়েরা কাঁদছেন।

তিনি চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। টাকাপয়সা চেয়ে।

বিদ্যাসাগরের নিজেরই তখন অবস্থা খারাপ। তবু তিনি ধারকর্জ করে টাকা জোগাড় করেন আর পাঠিয়ে দেন মাইকেলকে।

সেই টাকা পেয়ে মাইকেল চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে :

প্রিয় বন্ধু,

গত মাসের ২৮ তারিখ রোববার আমি বসে আছি আমার ছোট্ট পড়ার ঘরটিতে, এই সময় আমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এল আমার কাছে, বলল, ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চাইছে, কিন্তু হাতে আছে মাত্র তিন ফ্রাঁ (তখনকার দিনে এক টাকারও কম)। আচ্ছা, ভারতের লোকেরা আমাদের সঙ্গে এ রকম করছে কেন? আমি বললাম, আজকে তো ডাক আসবে, আজকে অবশ্যই একটা খবর পাব। কারণ, যাঁকে আমি লিখেছি, তার জ্ঞান আর প্রতিভা প্রাচীন ঋষির মতো, উদ্যম একজন ইংরেজের মতো, আর হৃদয়টা একটা বাঙালি মায়ের। আমি ঠিকই বলেছিলাম। কারণ ঘণ্টাখানেক পরেই তোমার চিঠি আর দেড় হাজার টাকা এসে পৌঁছাল। আমার মহান, কীর্তিমান পরম বন্ধু, কী বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব। তুমি আমাকে জীবন দান করেছ।'

www.amarboi.org

এই ছিলেন বিদ্যাসাগর। যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে কেউ কোনোদিন প্রত্যাখ্যাত হয় না।

মধুসূদন আরো আরো টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠিগুলো ছিল আকুতিতে ভরা। প্রত্যেকবার ঈশ্বরচন্দ্র তাকে টাকা পাঠিয়েছেন। এ জন্যে তাকে কাগজপত্র বন্ধকও রাখতে হয়েছিল।

মধুসূদন তাঁর বই উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন গোটা তিনেক।

একটা কবিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেটা এ রকম :

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে!

বিদ্যাসাগরের পাঠানো টাকায় ব্যারিস্টার হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফিরে এলেন কলকাতায়। ঈশ্বরচন্দ্র কবির জন্যে দোতলা বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করে রেখেছিলেন। কিন্তু বেহিসাবি অপরিণামদর্শী মাইকেল সেই বাড়িতে না উঠে উঠলেন সবচেয়ে দামি হোটেলে। সেই হোটেলের তিনটা রুম তিনি ভাড়া করলেন। দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছেন। বিদ্যাসাগর দেখা করলেন মাইকেলের সঙ্গে। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পরে চুমু খেতে লাগলেন মাইকেল।

বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন হোটেল ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে উঠতে। তাঁর জন্যে তো বাড়ি তৈরিই রেখেছেন তিনি। কিন্তু দুরন্ত কবি কি শোনে এইসব ভদ্র কথা!

মাইকেল ব্যারিস্টারি করা শুরু করলেন। আয়ও হতে লাগল।

কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই খানাপিনাতেই তার ব্যয় হয়ে যাচ্ছে সব।

কিছুদিনের মধ্যে আবার টাকার অভাব দেখা দিল মাইকেলের। আবার হাত পাতলেন তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে।

www.amarboi.org

বিদ্যাসাগর মাইকেলকে খুবই স্নেহ করতেন। লোকে তাকে বলত, মাইকেলকে টাকা দেন কেন, সে তো আপনার ঋণ শোধ করতে পারবে না।

বিদ্যাসাগর জবাব দিতেন, মাইকেলের কাছে বাংলা কাব্যসাহিত্যের যে ঋণ সেটাও তো কেউ শোধ করতে পারবে না। আমার কাছে তার ঋণ সে তুলনায় কিছুই না।

মাইকেল বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখেছেন, দুটো ব্যাপারে আমার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বরের ওপরে আর ঈশ্বরের পর, আপনার ওপরে।

বিদ্যাসাগরকে মাইকেল বর্ণনা করেছেন, এ যাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে।

মাইকেল মধুসূদন মারা গেলেন ১৮৬০ সালে।

তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই উদ্যোগী হলো কবির সমাধির ওপরে একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে, যাতে করে মাইকেলের অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়।

তারা গেল বিদ্যাসাগরের কাছে। চাঁদা চাইতে।

বিদ্যাসাগর বললেন, দ্যাখো, প্রাণপণ চেষ্টা করে যার জানটা রাখতে পারিনি, তার হাড় রাখবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।

১৩

একদিন এক পাড়াগাঁর ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছে এক নারীর কান্না। কী হয়েছে? একজনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জানা গেল, এই নারীর স্বামী মারা গেছেন। গয়নাপত্র বিক্রি করে সব কিছু নিঃশেষ করে মেয়েটা তার চিকিৎসা করিয়েছে। এখন স্বামীও রইল না, মেয়েটিও নিঃস্ব।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটির স্বামীর কী নাম?

জানা গেল, মেয়েটির স্বামীর নাম ছিল রাম।

অমনি বিদ্যাসাগর রামদাদা রামদাদা বাড়ি আছ, বলতে বলতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

www.amarboi.org

সদ্য বিধবা মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তিনি আর নেই গো।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'কী বলো। রামদাদা মারা গেছেন। তিনি যে আমাকে বিপদে ফেলে গেছেন।'

মেয়েটি ভাবল, বোধহয় আরেকজন পাওনাদার এসেছে টাকা চাইতে।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়ে গেছেন। বিপদে পড়লে আমার কাছে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন। সেই টাকা আমি তোমাদের একবারে দিতে পারব না। মাসে মাসে পাঠাব।'

এই ছিলেন বিদ্যাসাগর। কতজনকে যে কতভাবে কতকিছু দান করেছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

তাঁর নিজের আর পরিবারের খরচ ছিল সামান্য। কারণ খুবই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন তিনি। একটা ধুতি, একটা চাদর, একজোড়া চটি এই তো ছিল বেশ। কিন্তু আয় কম ছিল না। সে আমলে যখন লোকে দশ টাকা বেতনের চাকরিও করত, তখন তিনি ৫০০ টাকা ৭০০ টাকা বেতনের চাকরি করতেন, বই বিক্রির টাকাও পেতেন। এই টাকা তিনি পুরোটাই দান করে দিয়েছিলেন। দান করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের খরচ জোগাতে গিয়ে তাঁর অনেক টাকা ধার করতে হয়েছিল।

কবি নবীনচন্দ্র তখনও কবি হননি। কেবল স্কুল পাস করে বেরিয়েছেন। এরপর কলেজে পড়বেন। তাই চট্টগ্রামের এই তরুণ আর তার বড়ভাই হাজির হলেন কলকাতায়। কলকাতায় তাদের কোনো অভিভাবক ছিল না। সুতরাং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো বিদ্যাসাগরের কাছে।

নবীনচন্দ্র অবশ্য বিদ্যাসাগরকে দেখে প্রথম চোটে যথারীতি হতাশ হলেন। সবাই যেমনটা হয় আর কী। গোল করে চুল ছাঁটা, পায়ে চটি, পরনে ধুতি, হাতে হুঁকা, ছোটখাটো, কালো রঙের মানুষটিই সেই অতি বিখ্যাত বিদ্যাসাগর?

www.amarboi.org

বিদ্যাসাগর তাদের ঠিকানা নিলেন, বললেন, খোঁজখবর দেবে, অসুখবিসুখ হলে অবশ্যই জানাবে।

পরে ঠিকই বিদ্যাসাগর গিয়ে হাজির হলেন নবীনচন্দ্রের ডেরায়। সেদিন অবশ্য নবীনচন্দ্র বাসায় ছিল না।

ফিরে আসার পরে দারোয়ান জানাল, কেউ একজন এসেছিল।

বিদ্যাসাগর নয় তো?

দারোয়ান বলল, না তিনি বিদ্যাসাগর হতেই পারেন না। সাধারণ গরিব মানুষ-কেউ একজন।

নবীনচন্দ্র গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর জানালেন, ঠিকই তিনি গিয়েছিলেন নবীনচন্দ্রের বাসায়। বললেন, এই তোমরা পশ্চিমদুয়ারি ঘরে থাকো কেন। এ তো ভয়ানক কষ্টকর। চলো তোমাদের জন্যে বাড়ি দেখে আসি।

মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর বের হলেন এই নবাগত তরুণদের জন্যে বাড়ি খুঁজতে।

বছর চারেক পরে নবীনচন্দ্রের বাবা মারা যান।

বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন তাদের এই বিপদের কথা। মৃত্যুর সময় বাবা কোনো টাকাকড়ি রেখে যাননি। অনেক বড় সংসার।

তোমাদের মাসে কত টাকা দরকার হয়?

নবীনচন্দ্র জবাব দিলেন, কুড়ি টাকা। আমার দুটো টিউশনি থেকে ও আমি রোজগার করতে পারব। মায়ের জন্যেই চিন্তা।

বিদ্যাসাগর একটা চিঠি লিখে নবীনচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে এই চিঠিটা একটু পৌঁছে দিতে পারবে?

পরদিন নবীনচন্দ্র চিঠিটা লাইব্রেরিতে দিলে কর্মচারী তাকে চল্লিশ টাকা দিল। টাকা কেন? আমি তো টাকা চাইনি? বললেন নবীনচন্দ্র।

তা তো জানি না। আমার ওপরে যা আদেশ হয়েছে, আমি তাই করেছি।

পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র অনেক বড় কবি হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *পলাশীর যুদ্ধ* উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের নামে।

www.amarboi.org

উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছিলেন, দয়ার সাগর, পূজ্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্রীচরণে...

একদিন বিদ্যাসাগর এক বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, গঙ্গাস্নান সেরে একজন ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে ফিরছে।

বিদ্যাসাগর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

ব্রাহ্মণ খানিকটা বিব্রত কণ্ঠে বলল, আমি একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে টাকা শোধ করতে পারিনি। পাওনাদার আমার নামে আদালতে নালিশ করেছে। পরশু মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের বাড়ির ঠিকানা কথায় কথায় সব জেনে নিলেন বিদ্যাসাগর।

পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ব্রাহ্মণের ঋণের পরিমাণ সুদে-আসলে দাঁড়িয়েছে আড়াই হাজার টাকা।

ব্রাহ্মণ কিছুই জানতে পারল না। আদালতে গিয়ে দেখল, কেউ একজন তার সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়েছেন।

১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এক মুঠো ভাতের অভাবে শাকপাতা, কচুপাতা, শেকড়বাকড় খেতে বাধ্য হয় বাংলার মানুষ। চারদিকে হাহাকার।

ঈশ্বরচন্দ্র ছুটে যান তাঁর গ্রাম বীরসিংহে। সেখানে অন্নছত্র বা লংগরখানা খোলেন। সেখানে ১২ জন লোক দিনরাত রান্না করত, পরিবেশন করত ২০ জন। লোকেরা সেখানে বিনে পয়সায় খেতে পারত। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দিনরাত দিয়েও কুলোনো যাচ্ছে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন, সবাইকে খেতে দাও। কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। টাকা আমি যেখান থেকে পারি এনে দিচ্ছি।

ওই অন্নছত্রে নীচু জাতের মেয়েরাও আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মাথার চুল ছিল রুক্ষ। যারা তেল বিক্রি করত, তারা নীচু জাতের মেয়েদের ছুঁয়ে ফেললে পাছে জাত যায়, সে জন্যে দূর থেকে তেল ঢেলে দিত। তাই দেখে বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে এই গরিব তথাকথিত অচ্ছুত মেয়েদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

একদিকে এই রকম দয়া, দাক্ষিণ্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না মানা,

অন্যদিকে তার তেজও ছিল প্রচণ্ড।

এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ। তিনি তার সেই সাধারণ বেশ ধারণ করে গেলেন সেই বাড়িতে। দারোয়ান যথারীতি ভুল বুঝল আর তাঁকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল।

ঈশ্বরচন্দ্র ফিরে এলেন। নিজের বাড়ির দরজায় লোক দাঁড় করিয়ে রাখলেন দারোয়ান বানিয়ে।

বললেন, এক্ষুণি একজন আসবে আমার কাছে। তুমি কিছুতেই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। তাড়িয়ে দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমন্ত্রণদাতা ভদ্রলোক এসে হাজির তাঁর দুয়ারে। যথারীতি তাকে সাজানো দারোয়ান বাধা দিল এবং ফিরিয়ে দিল।

একদিন বিদ্যাসাগর গেছেন সরকারের বড় কর্তা ইডেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। এমনি সাধারণ খোশগল্প হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। এমন সময় সাহেবের কাছে একজন দর্শনার্থী এসে তার নিজের নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ চাপরাসির হাতে পাঠালেন। সাহেব বললেন, গিয়ে বলো এখন ফুরসত নাই।

বিদ্যাসাগর বললেন, আমরা তো বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি। আর ওই সাক্ষাৎপ্রার্থী নিশ্চয়ই জরুরি কোনো কাজে আপনার কাছে এসেছেন। আপনি তাকে বলছেন ফুরসত নাই। বেচারাকে আরেকদিন গাড়িভাড়া নষ্ট করে আসতে হবে।

ইডেন সাহেব তখন ওই লোককে সাক্ষাতের জন্যে ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

বিদ্যাসাগর কখনও হিন্দু মুসলিম ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ করতেন না। ১৮৯১ সালে বর্ধমানে খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে ডাক্তার আর ওষুধপত্র নিয়ে ছুটে গেলেন সেখানে। ছোটঘর, বড়ঘর, জেলে-তাঁতি, ডোম-হাঁড়ি সব মানুষের সেবা করে বেড়ালেন। মুসলমান ছেলেকে নিজের কোলে বসিয়ে সেবা করতেন।

আবার তাঁর কিপ্টেমির গল্পও বহুল প্রচারিত।

www.amarboi.org

তিনি শিলপাটা ধোওয়া পানি ফেলতে দিতেন না। এটা অবশ্যই তরকারিতে ঢালতে হবে। গাড়িতে চড়তে চাইতেন না। এটাকে তিনি অপব্যয় মনে করতেন। খুব হাঁটতে পারতেন। হাঁটতে পছন্দও করতেন।

কোনো কিছু ফেলতে দিতে চাইতেন না। এক টুকরা কাগজ, একটু দড়িও তুলে রাখতেন যত্ন করে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বহু বড় বড় মানুষের খাতির হয়েছিল। নানাভাবে যোগাযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার গেলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের উদ্দেশ্য একটা সাহিত্য সমিতি করবেন।

এই সমিতির কথা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, তোমরা বড়মানুষের ছেলে। কোনো বদখেয়ালি না করে এসব নিয়ে যদি সময় কাটাও তো সে ভালোই। কিন্তু বাবা একটা কথা আমি তোমাদের বলে দিই, বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের তোমরা তোমাদের এই সমিতিতে নিও না, তাহলে সবই মাটি হয়ে যাবে।

সমিতির কাজ আরম্ভ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথরা। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদেরই নেয়া হলো। ফলটি দাঁড়াল, কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির কাজ বন্ধ হয়ে গেল, সব মাটি হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় বাড়িতে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামের এক শিক্ষকের কাছে পড়তেন। শিক্ষক তাঁকে শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ করতে বলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তাঁকে আটকে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করতে হতো বাংলা ছন্দে। পুরোটা অনুবাদ হয়ে গেলে রামসর্বস্ব পণ্ডিত নামের এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে বললেন, চলো, এই অনুবাদটা বিদ্যাসাগরকে পড়ে শোনাবে, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগরের ঘরে বালক রবীন্দ্রনাথ ঢুকছেন। ঘরে শুধু বই আর বই। রবীন্দ্রনাথের বুক কাঁপছে। ঘরে আরও বসে ছিলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের মুখ দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। তবু সেদিন তিনি উৎসাহের সঙ্গেই ম্যাকবেথের অনুবাদ পড়ে শোনাতে পেরেছিলেন, কারণ, রবীন্দ্রনাথ জানতেন, অনেক বড় একজন শ্রোতা তিনি আজ পেয়েছেন। এত বড়

www.amarboi.org

শ্রোতাকে লেখা পাঠ করে শোনানো একটা গৌরবের বিষয়। সত্যি বিদ্যাসাগর যখন পুরোটা শুনলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে নানা কথায় উৎসাহিত করলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই উদ্দীপিত বোধ করেছিলেন। অনেক উৎসাহ নিয়েই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি ফিরেছিলেন।

১৪

বিদ্যাসাগর শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন কার্মাটারে সাঁওতালপল্লীতে, সাঁওতালদের মধ্যে। অভিমান করে বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। মাকে, ভাইদেরকে, স্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, তারা যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেয়, তিনি নিয়মিতভাবে বাড়িতে টাকা পাঠাবেন কিন্তু নিজে আর কখনও আসবেন না। সংসারের ওপরে তাঁর বৈরাগ্য এসে গেছে।

কলকাতা যেতেন। যেতেন তার নিজের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে। আর থাকতেন সেই সাঁওতালপল্লীতে।

শেষ জীবনে তিনি একা হয়ে পড়ছিলেন। বন্ধুবান্ধব কমে যাচ্ছিল।

তাঁরও বড় অভিমান হয়েছিল অনেকেরই ওপর। কেউ একজন তাঁর নামে নিন্দে করছে শুনে তিনি একবার বলেছিলেন, সে আমার নিন্দে করেছে? কেন? আমি তো তার উপকার করিনি কোনো।

এই তাঁর উপলব্ধি। উপকার করলে বিনিময়ে পাওয়া যায় সমালোচনা, নিন্দা।

সাঁওতাল পরগনার কার্মাটারে একটা বাড়িও বানিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সাঁওতালদের মধ্যে থাকতেন। তাদের সঙ্গে মিশতেন। তাদের নাচ দেখতেন। তাদের সারল্য তাকে মুগ্ধ করত।

সাঁওতালরা তাঁকে ঘিরে ধরত। তিনি তাদের দুহাতে বিলাতেন। কাপড়-চোপড়, খাবার-দাবার, ওষুধ।

সাঁওতালদের ছেলেমেয়েদের জন্যেও একটা স্কুল খুলেছিলেন তিনি।

www.amarboi.org

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলেই ঘিরে ধরত। কী এনেছিস, আয়না কই, চিরুনি কই। আছে আছে বলে এসব একে একে সব বাচ্চার হাতে তুলে দিতেন তিনি।

সাঁওতালদের খাওয়ানোর জন্যে ভুট্টা জড় করে রেখেছেন। ওরা এল। আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ভুট্টা খেল। খুশি হয়ে বলল, আজ বিদ্যাসাগর অনেক খাইয়েছে। ওদের খাওয়ানোর জন্যে খেজুর আনিয়েছিলেন। ওদের ভালো লেগেছিল। খেয়ে বলেছিল, আবার আনিস।

এক সাঁওতাল পুরুষ সঙ্গে একটা মেয়ে নিয়ে এসেছে। পুরুষটি বলল, ওকে একটা শাড়ি দে।

শাড়ি তো নেই।

তুই চাবি দে। আমি ঘরে ঢুকে সিন্দুক দেখব।

বিদ্যাসাগর চাবি দিলেন। ওরা সিন্দুক খুলল। অনেক শাড়িই ছিল তাতে। সাঁওতাল মেয়েটি একটা শাড়িই নিল।

বিদ্যাসাগর আর বীরসিংহ গ্রামে যান না। বীরসিংহ গ্রামের পক্ষ থেকে একটা চিঠির মতো লিখে বই আকারে বের করে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। সেটি বিদ্যাসাগরের হাতেও পড়েছিল।

সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল :

'বাবা ঈশ্বর, আজ ১৮/১৯ বছর হোল তুমি আমাকে ভুলে আছ। আজ ১৮/১৯ বছর তোমার চাঁদ মুখটি দেখতে পাইনি। বাবা, সকলেই বলছে বিদ্যাসাগর আর দেশে আসবেন না। তবে কি বাবা, সত্যই তুমি আমাকে ভুলে গেছ? ঈশ্বর, প্রাণের ধন আমার, তবে কি সত্যই তোমাহারা হলাম।' ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায়। তার শরীর খুবই খারাপ হয়ে আসছে। হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন তাকে দেখতে এসেছেন। বললেন, আপনি কার্মাটারে গিয়ে থাকুন না কেন, ওইখানেই তো আপনি ভালো থাকেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, সেখানে থাকতে পারলে আমি সত্যি ভালো থাকতাম। কিন্তু সেখানে থাকার উপায় নেই। কারণ ওখানে যে একসের চাল, আধাসের অড়হর ডাল, আধাসের আলু আর একসের মাংস খেতে পারে, তাকে এখন পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু

www.amarboi.org

খেয়ে থাকতে হয়। তার বেশি জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করব, আর আমার চারদিকে সাঁওতালরা না খেয়ে মারা যাবে আমি দেখব, এ কি আমি সইতে পারি!

বলে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ৭১ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুবরণ করেন। ক্যান্সার হয়েছিল তাঁর।

অনুসন্ধান নামের একটা খবরের কাগজ তার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বলেছিল, বাঙালির শিক্ষাগুরু, বাংলাভাষার জন্মদাতা, কত অনাথ-আতুরের সহায়-সম্বল জগতকে কাঁদিয়ে বাংলাকে শোকে ডুবিয়ে অনন্তধামে চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" রবীন্দ্রনাথের মতে, বাঙালির মধ্যে যে দু একজন মানুষ ছিলেন, তার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন।

এই রকম একজন মানুষের মতো মানুষের সঙ্গে দেখা করতে একবার এসেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'এতদিন ডোবায় ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'সাগরে যখন এসেছেন, তখন লোনা জল খেয়ে যান খানিক।'

'লোনাজল কেন? তুমি কি অবিদ্যার সাগর। তুমি যে বিদ্যার সাগর।'

ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যার সাগর কিংবা দয়ার সাগর ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মের সাগর।

আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটা খুবই দরিদ্রঘরে, লেখাপড়া করেছিলেন একটা দুর্গম গ্রামের ছোট্ট পাঠশালায়, ৬০ মাইল হেঁটে কলকাতায় পড়তে গেলেন ৮ বছর বয়সে, কাজ করতে করতে তার আঙুল আর নখ তখন ক্ষয়ে

www.amarboi.org

যেত, সেখান থেকে কী একটা বিশাল সাগরসমান মানুষই না বাঙালি লাভ করেছিল।

আমরা যখন সাগরের সামনে দাঁড়াই, তখন তার বিশালতা দেখে, মহত্ত্ব দেখে বিস্মিত হই।

কিন্তু সাগরে তো শুধু এক ধরনের জলই থাকে, বহু ধরনের জল থাকে না।

বিদ্যাসাগরের ছিল অনেক গুণের অনেক কর্মের অনেক মহত্ত্বের জল।

তার কথা উঠলে সাগরদর্শনের চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময় বেশি শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

www.amarboi.org

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841803461205